ঢুলি

শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য্য

'তুলি' প্রকাশ করেছেন
কেতাবী থেকে
শ্রীমিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমলকুমার ভট্টাচার্য্য (পিণ্টু)

বইটি ছেপেছেন
৩২/বি জয় মিত্র ষ্ট্রীটের
'সরমা প্রেস' থেকে
শ্রীগৌরহরি দাস

'তুলি'র পরিবেশন ভার নিয়েছেন
'গ্রন্থিকে'র স্বত্বাধিকারী
বিনায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদ ব্লক তৈরী করেছেন
৩২/বি জয় মিত্র ষ্ট্রীটের
পিক্টো-টাইপ সিণ্ডিকেট

প্রচ্ছদ চিত্র এঁকেছেন
শিল্পী এস, দত্ত

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৬০
দাম দু' টাকা

কেতাবী'র ঠিকানা—[illegible] রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

কৈশোরের আধো-আলো, আধো-ছায়া ভরা দিনগুলিতে, যখন পৃথিবীর সব পথ—স্কুল থেকে বাড়ী আর বাড়ী থেকে স্কুলের পথে এসে মিশেছে,—আমার সেদিনের সেই ছোট্ট সংকীর্ণ পৃথিবীতে, যাঁর দীর্ঘ দেহ ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি ছিল 'শিক্ষক' নামক ভয়াবহ ব্যাপারের সগর্ব্ব ব্যতিক্রম, যাঁর বাণী 'মাভৈঃ' উচ্চারণ করতো পড়া-পরাঙ্মুখ ছাত্রদের প্রাণে; যাঁর স্নেহ, প্রেম আর শিক্ষার সমুদ্রে অবগাহন ক'রে আমরা শুচিস্নাত হ'য়েছি,—কৃতী এবং অ-কৃতী উভয়বিধ ছাত্রদের নিয়ে আজও যাঁর গর্ব্বের শেষ নেই, সেই আমাদের জিয়াগঞ্জ হাই স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক পূজ্যপাদ **শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়** মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে প্রণাম ক'রে আজ আমার এই 'তুলি' দক্ষিণা দিয়ে ধন্য হলাম।

জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
১৩৬০।
শিবচতুর্দ্দশী

প্রণতঃ
শ্রীবগলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য
(বিধায়ক)

আমার

....কে

আজ...

....

দিলাম।

পড়তে সুরু করার আগে—

'রূপমঞ্চে'র গেল বছরের শারদীয়া সংখ্যায় ঢুলি প্রকাশিত হ'য়েছিল ; তার জন্য বন্ধুবর **শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়কে—**

এ-জে প্রোডাক্‌শান্ থেকে যিনি প্রায় জোর ক'রে আমার কাছ থেকে গল্পটির বাংলা চিত্রস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন, সেই বন্ধুবর **জীবেন বোসকে—**

দিবারাত্রি কাছে বসে থেকে অসীম প্রেমে আর ধৈর্য্যে এটি লেখা শেষ করিয়েছিলেন সেই কল্যাণীয় **শ্রীমান অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়** (ঢুলু) ও কল্যাণীয় **শ্রীমান নচিকেতা ঘোষকে—**

এটিকে ব'য়ের বাঁধনে বেঁধেছেন **শ্রীমিহির বন্দ্যোপাধ্যায়** ও **শ্রীঅমলকুমার ভট্টাচার্য্য** (পিণ্টু) কে—

এটিকে কপি করবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন **শ্রীমান মন্টু ও শ্রীমতী রুবী ভট্টাচার্য্য—**

আজকে 'ঢুলি' প্রকাশের পুণ্যক্ষণে প্রত্যেককে জানাই আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম ও স্নেহ·····

আর

কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আমার লেখা নাটক বা উপন্যাস পড়ে কিছুমাত্র আনন্দ লাভ করেন—সেই অগণিত **বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের** ।

বাংলার মর্ম্ম কেন্দ্র কোলকাতা থেকে বাংলায় খবর বলছি। আজকের খবরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে—

১) ভারত-বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার শ্রীপরাশর ঢুলি (দাস) গতকাল সকাল ১০টায় বম্বের থেকে এক মাইল দূরে একটি নির্জ্জন বাংলোয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রকাশ, যে তাঁর মৃত্যুকালে প্রিয়তমা ছাত্রী ও গায়িকা শ্রীমতী মিনতি উপস্থিত ছিলেন…

২) প্রৌঢ় উদ্বাস্তু সনাতন রায় চৌধুরীর ষোড়শী স্ত্রী শোভনার পরশু ভোর ৮টা থেকে কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সনাতন ও তার বৃদ্ধা মা এখনো শিয়ালদহ ষ্টেশনেই আছেন। পুলিশ তদন্ত চলছে।

৩) বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় জমিদার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বলরাম চৌধুরীর একমাত্র পৌত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশ চৌধুরী রহস্যজনকভাবে তাঁর পিতৃপুরুষের গোপন ধন সম্পত্তির সন্ধান পেয়ে পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রাসাদে ফিরে গেছেন। বাড়ী ঘর সংস্কার হচ্ছে। প্রকাশ, আগামী বৈশাখে পুর্ব্বপুরুষের প্রবর্ত্তিত অন্নসত্র ভবনটির পুনরুদ্বোধন হবে। কথা আছে, বাংলার রাজ্যপাল এই উৎসবে সভাপতিত্ব করবেন।

৪) স্বনাম-ধন্যা গায়িকা, শিক্ষয়িত্রী ও সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী কলাবতী স্বীকার করেছেন যে আগামী ২রা জানুয়ারী তিনি তাঁর নব বিবাহিত স্বামী পোল্যাণ্ডে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত মিঃ দীপম্ আয়ারের সঙ্গে ওয়ার্‌শ যাত্রা করবেন। প্রকাশ, এই উপলক্ষে তাঁদের পৃথিবী পরিভ্রমণের অভিলাষও আছে।

আজকের খবরগুলির বিস্তৃত বিবরণ হচ্ছে—

কুঞ্জ ঢুলীর নাতি পরাশর ঢুলী। এখন আর তারা নিজেদের ঢুলী বলেনা, বলে দাস। পরাশর দাস'। সেই পরাশরকে নিয়েই আজকের এই কাহিনী। কিন্তু গল্পটি সুরু করবার পূর্বে তার উপক্রমণিকা আছে—পূজোর আগে বোধনের মত; তাতে পূজোর উৎকণ্ঠা আছে, উৎকৃষ্টি নেই। তেমনি কুঞ্জকে না জানলে পরাশরকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। আর পরাশরের বিচিত্র জীবন নিয়ে কাহিনী আরম্ভ করবার আগে কুঞ্জ ঢুলীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা চাই-ই চাই, নইলে এ কাহিনী কিছুতেই পরিণতি লাভ করতে পারে না।

কুঞ্জ ঢুলী। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি নিবিড় পল্লীগ্রাম ভগীরথপুর থেকে প্রতি বৎসর ৺মহাপূজার সময় বালুচরের বাংলা-মায়ের মন্দিরে সে ঢাক বাজাতে আসে। ঘড়ির কাঁটার মতো, প্রতি বৎসর---একই সময়ে, একই জায়গায়। বালুচরের বাংলা-মন্দিরের প্রথম পূজারী ৺চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, তারপরে তাঁর পুত্র ৺বঙ্কবিহারী ভট্টাচার্য্য, তারপর তাঁর পুত্র ৺হরিচরণ ভট্টাচার্য্য, তারও পরে হরিচরণের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নাটু ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানের পূজারী। নাটুরা পাঁচ ভাই দুই বোন। বড় আর মেজ ভাই বগলা আর বিমলা থাকে কোলকাতায়, নাটুর পরের দুটি ভাই শীতল আর পিণ্টু থাকে বগলার কাছে। শুধু পৈত্রিক যজমান রক্ষার কাজে নাটু থাকে বালুচরে — মা, স্ত্রী আর দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে। কুঞ্জ প্রথম ঢাক বাজাতে আসে বঙ্কবিহারীর সময়ে। বঙ্কবিহারী গত হন ৭৬ বৎসর বয়সে। হরিচরণের পূরো আমল কুঞ্জ ঢাক বাজিয়েছে। কুঞ্জ শ্রীদুর্গার দরবারে আসতো সপরিবারে। এক ভাই, দুই ছেলে, এক জামাই, দু'টি নাতি (মেয়ের ছেলে) আর ছেলের ছেলে ওই পরাশর। আট বৎসর বয়সে ঠাকুরদাদার

সংগে বাংলা-মন্দিরে প্রথম এল। কিন্তু ওইটুকু বয়সেই কাঁসি বাজিয়ে সে সকলকে চমৎকৃত ক'রে দিয়েছিল। সকলকে এক বাক্যে স্বীকার কর'তে হ'য়েছিল যে এমন লয়দার কাঁসি বাজিয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। শুধু কাঁসি বাজিয়ে বলেই যে পরাশর সুখ্যাতি পেল, তা নয়। সে আরও প্রশংসা পেল তার রূপের জন্য। ওই জাতের মধ্যে এমন রূপবান ছেলে চট্ ক'রে চোখে পড়ে না। প্রশস্ত কপাল, বড় বড় টানা টানা ছু'টি চোখ, আট ন' বছরের ছেলেকে দেখে মনে হয় ষোল সতেরো বছর বয়স। গ্রাম থেকে পঞ্চমীর দিন আসতো কুঞ্জ, ষষ্ঠি থেকে দশমী অবধি বাজিয়ে একাদশীর দিন বাংলা-মন্দিরের দক্ষিণা নিয়ে সোজা চলে আসতো ভট্টপাড়ায় ভট্‌চাযিয় বাড়ীতে; সেখানে বাড়ীর মেয়েদের বাজনা শুনিয়ে প্রত্যেকে একখানি ক'রে নতুন কাপড় মাথায় জড়িয়ে নিয়ে—পূজোর প্রসাদী কুমড়ো, নারকেল, কলা, আক প্রভৃতি বেঁধে চলে যেতো খাগড়ায় কালীপূজোর বাজনা বাজাতে দল বেঁধে...

এখনো মনে পড়ে কুঞ্জকে। ছোট্ট খাট্টো কালো রংয়ের মানুষটি। বলী-অঙ্কিত মুখ। সদা হাস্যময়। একবার—পূজোর আগে বঙ্কবিহারী খবর পেলেন—যে, কুঞ্জ এবার বাজাতে আসতে পারবে না। তার কারণ, তার বড় ছেলে শংকরা মারা গেছে। বঙ্কবিহারী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—শংকরা মারা গেছে কি হে?

—আগ্‌গ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুর মাশায়।

—কি হ'য়েছিল?

—অ্যাগগ্যাঁ জ্বর।

বঙ্কবিহারী চিন্তায় পড়লেন। কুঞ্জ না এলে সন্ধি পূজোর ওই বাজনা বাজাবে কে? বাজনার সঙ্গে ভক্তের ওই উদ্দাম নৃত্য, কুঞ্জ ছাড়া আর

কি কেউ পারে? শুধু তাই নয়, বিজয়ার বাজনায় অমন বুকফাটা করুণ রোল তো আর কোন ঢাকীর হাত দিয়ে বেরোবে না। পূজা কমিটি চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁরা সদলবলে এসে বঙ্কবিহারীকে বললেন—কুঞ্জতো পারবেনা, আর কোন ঢাকী না হয় দেখা যাক! বঙ্কবিহারী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জগদম্বার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেওনা হে। আসতে পারবে না বলে কুঞ্জ কি কোন খবর পাঠিয়েছে?

—আজ্ঞে না।

—তবে? মায়ের বাজনার ভার, মায়ের ওপরই ছেড়ে দাও। দ্যাখোইনা—সে বেটি কি করে! এই কথার পর সকলে পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলে গেলেন।

পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় বঙ্কবিহারীর সদর দরজার বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল—মা ঠাগ্‌র‍্যান গো! আমরা এল্যাম গো!...বামাসুন্দরী, বঙ্কবিহারীর সহধর্মিনী দরজা খুলে দিলেন। উঠানে সদলবলে কুঞ্জ ঢুলী প্রবেশ ক'রে সাষ্টাংগে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। বামাসুন্দরী চট্ ক'রে একবার দেখে নিলেন, সংবাদ দাতার খবর সত্য না মিথ্যা। নাঃ! দলের মধ্যে শংকরা তো নেই! সেই চিরপরিচিত-সদাহাস্যময়-পিতৃমুখ শংকরা—সে আজ তার বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে দুর্গা পূজার বাজনা বাজাতে আসেনি। বামাসুন্দরীর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে দেখে কুঞ্জ বললো—

—শংকরাটা মরে গ্যালো মা ঠাগ্‌র‍্যান! মা দুগ্‌গা উয়াকে লিয়ে লিলো এব্‌য়্যার! বলতে বলতে এই সাত্ত্বিক ধর্ম্মপ্রাণ কুঞ্জ ঢুলীর চোখের কোণে দেখা দিল অশ্রুর আভাস। একটু থেমে ম্লান হেসে বললো—

—এব্‌য়্যার জিতুয়া পূজ্‌য়্যার দিন উ আমাকে বুললো—বাবা! সন্ধি

পূজ্য়্যার বাজ্না বছরে বছরে তুমি একা বাজাবা ক্যানে ? আমরা কি বোল্ শিখিনি ? ছোঁড়ার কথা শুন্য়্যা আমার তো রাগ হ'য়ে গ্যালো—মা ঠাগ্র্যান। বল্ল্যাম—ব্যাটা, সন্ধি-পুজ্য়্যার বাজনা বাজাতে তোর বাপেরই এখুনো জান লড়্য়্যা যায়—তা' তুই ! ...একথা শুন্য়্যা উ আমার সংগে কাজিয়া করলো মা ঠাগ্র্যান ! বুললো—তেবে আমি কাঁসি বাজাবো ! আমার ব্যাটা পর্যাশ্য়্যা বাজাতে পারে—আর আমি পারবো না ক্যানে ? বুললাম—তাই বাজাস্। ...খুব বাজনা. বাজাছে আমার ব্যাটা। খুব বাজনা বাজাছে !—টপ্টপ্ ক'রে দু'ফোঁটা জল চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়লো মাটিতে। কুঞ্জ আবার সাষ্টাংগে প্রণাম ক'রে বললো—ঠাকুর মাশায়কে দেখ্ছিন্য়া ক্যানে ?

—বাজারে গিয়েছেন।

—হরিচরণের ব্যাটা বিটিরা ক্যামুন আছে মা ঠাগ্র্যান ?

—ভালই আছে কুঞ্জ !

—জয় মা দুগ্গা ! সবাইকে বাঁচিয়ে-বত্তিয়ে রাখো মা ! আমার আর্জিটা মনে আছে তো মা ঠাগ্র্যান ?

—কী আর্জি কুঞ্জ ?

—হরিচরণের বড় ব্যাটা বগলার বিহাতে আমি গরদের জোড় লিবো !

—বেশতো কুঞ্জ। আশীর্ব্বাদ করো—বেঁচে থাকুক ওরা—তোমাকে দেবে গরদের জোড়।...শিশুর মত সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো কুঞ্জর রেখাংকিত মুখমণ্ডল,—ফোক্লা দাঁতগুলি বার ক'রে বললো—মা দুগ্গার দয়ায় লিচ্চয় ভালো থাকবে উয়ারা। লিচ্চয় ভালো থাকবে। আচ্ছা, মা ঠাগ্র্যান—মন্দিরে যেছি তেবে...

সেই কুঞ্জ ঢুলী···

ওদের যেন একটা নাড়ীর টান ছিল বঙ্ক বিহারীর পরিবারের সংগে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। কালক্রমে বঙ্কবিহারী গত হ'য়েছেন, এখন বাংলা মা'য়ের পূজো করছেন হরিচরণ ভট্টাচার্য্য। এখনও কুঞ্জই ঢাক বাজায়। সে আরও বুড়ো হয়ে গেছে। এবাবে বালুচরে পা দিয়ে বামাসুন্দরীকে প্রণাম করবার সময় কুঞ্জ বলে উঠলো—কাল রেতে স্বপোন দেখল্যাম মা ঠাগ্‌বান, য্যানে ঠাকুর মাশায় এসে আমাকে বুলছেন কুঞ্জ তুই যদি না আসিস, তেবে আমি ইখানে পূজ্য্যা করি কী কোর্য্যা বোল্‌ধিনি। তুই আয়! তাই বুলছি মা ঠাগ্‌র্যান—আর যদি—আর বছর থেক্য্যা আমি না আসি, যদি ঠাকুর মাশায় আমাকে তাঁর ছি চরণের তলা'য় টেন্য্যাই ল্যান, তা হ'লে ইয়্যারা সব থাক্‌লো—

—ছি ছি কুঞ্জ! বামাসুন্দরী যেন বিচলিতা হলেন। মরার কথা বলতে নেই। তুমি না থাকলে বাংলা-মায়ের পূজোয় খুঁৎ হবে যে। তা ছাড়া তুমি যে এখন মরতে চাইছো, বগলার বিয়েতে গরদের জোড় নেবে না?

—হ্যাঁ। ইয়্যাওতো একটা কথা হোচ্ছে বটে। তেবে কি খালি খালি ঠাকুর মাশায় আমাকে দর্শন দিলেন—হ্যাঁ মা ঠাগ্‌র্যান? ও কিছু নয়। ঠিক পূজোর সময়টা তাঁর কথাতো তোমার মনে হবেই। বললেন বামাসুন্দরী।

কিন্তু কুঞ্জর কথাই ফল্‌লো। সে এক বিচিত্র কাহিনী। পরের বৎসর মহালযার দিন থেকে কুঞ্জ পড়লো জ্বরে। জ্বর ছাড়তে যতই দেরী হচ্ছে—কুঞ্জ মনে মনে ততই অস্থির হচ্ছে। বাড়ীশুদ্ধ লোক তার বকাবকির চোটে পাগল হবার জোগাড়।

—আজ কি তারিখ হলরে ? ·· তোরা আমার কাছে লুক্‌য়্যাছিস্ না কী করছিস, তাই বোল্‌ধিনি। পোঞ্চুমীর দিন বালুচরে গিয়্যা পঁহুছাতে হবে—ইয়্যা মনে রেখো! আজই কি পোঞ্চুমী হ'ল না কি ? পরাশর নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়ায়। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে পিতামহের মুখের দিকে চেয়ে বলে—আজ দ্বিতীয়া, আরও তিন চার দিন আছে তোমার বালুচরে যেতে দাদু—ভয় নেই, তুমি ঠিক সেরে উঠবে। ···কুঞ্জ নিশ্চিন্ত হ'য়ে পাশ ফিরে শোয়।···

পরাশরের কিন্তু এই ক' বছরে ভীষণ উন্নতি হয়েছে। ইতিমধ্যে সে ইংরেজী স্কুলে লেখা পড়া শিখেছে,—খাগড়ায় একটি নামকরা ওস্তাদের কাছে নিয়মিত গান শিখে সে আজ বেশ উচু দরের গাইয়ে হ'তে চলেছে। তার চাল-চলন গেছে বদলে······সর্বোপরি ওই রকম দুষ্টু দামাল পরাশর—আজ সংগীতের যাদু-মন্ত্রে শান্ত-শিষ্ট স্থির ও সুন্দর পরাশরে রূপান্তরিত হ'য়েছে···

দূরের কোন্ গ্রাম থেকে ঢাকের বাজনা ভেসে আসছে···ঘুম ভেঙ্গে কুঞ্জ কান পেতে শুনলো সেই বাজনা···তার তখন ঘোর বিকারের পালা চলছে। সকলের অজান্তে কুঞ্জ ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসলো; এক পা, এক পা ক'রে নীচে নামলো··· এগিয়ে গিয়ে মাটির বেড়ার সংগে টাঙানো ঢাকটি তুলে নিজের পিঠের সংগে বাঁধলো—তারপর এক পা এক পা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তায় নামলো। শরতের শুক্লপক্ষ—জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে মাঠে-ঘাটে-পথে। আবার ঢাকের বাজনা ভেসে আসে হাল্‌কা বাতাসে। কুঞ্জ নিজের মনেই বললো—যেছি গো মা ঠাগ্‌র‍্যান যেছি! ঠাকুর মাহাশায়—যেছি ই-ই-ই-ইঃ! দীর্ঘ দিনের রোগাবসন্ন

দেহ আর বয়োজীর্ণ চরণ যুগল কাঁচা মাটির উপর ফেলে ফেলে কুঞ্জ ঢুলী চললো বালুচরে বাংলা-মায়ের পূজোর বাজনা বাজাতে।—এইতো, আর দু'পা গেলেইতো বালুচর !—ঘণ্টা বাজছে—বোধন হোচ্ছে বুঝি—?

পরের দিন ভোর বেলায় সকলে দেখলো, গ্রামের শেষে একটা বেলগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে—ঢাকটাকে বাজনার ভংগীতে কোলের কাছে টেনে নিয়ে, এবং—ঢাকের কাঠিটাকে ডান হাতে ধরে কুঞ্জ ঢুলী বসে আছে—কিন্তু মরে গেছে...

বালুচরের বাংলা-মন্দিরে তখন হরিচরণ সবেমাত্র সংকল্প শেষ ক'রে মহাসপ্তমী পূজা আরম্ভ করেছেন—

কুঞ্জর মৃত্যুর পর এই পরিবারে প্রকৃতপক্ষে পরাশরেরই হ'ল অসুবিধে। বাপ পিতামহের জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সে যে সাধনায় আত্মোৎসর্গ ক'রেছে—তা সদ্য সদ্য অর্থকরী না হওয়ায়, সে বাড়ীর সকলের সমালোচনার বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। সুযোগ পেয়ে পাড়ার পরহিত-ব্রতীর দল পরাশরের কাকার কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রের এই বড়লোকী-বৃত্তির সম্বন্ধে বিষ-উদ্গার করতে লাগলো। একদিন রাত্রে পরাশর রেওয়াজ সেরে বাড়ী ফিরে দেখলো—তার মা অন্ধকার দাওয়ায় চুপ ক'রে বসে আছে, দৃষ্টি তার তারা-ভরা আকাশের দিকে। পরাশর বুঝলো, নিশ্চয় বাড়ীতে কোন ঘটনা ঘটেছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে মায়ের কাছে বসলো, তারপর ডান হাতখানি মায়ের কাঁধে রেখে শান্ত গলায় প্রশ্ন করলো ;

—কী হয়েছে মা ? এখন শোওনি যে।

—কী ক'রে শুবো বাবা? তোকে সবাই মিল্য়্যা যাচ্ছাতাই করয়্যা বুলছে যে!

—কী বলছে মা?

—বুলছে, তুই নাকি এক পয়সা ঘরে আনতে পারবিন্য়্যা! খালি খালি গান শিখ্য়্যা তুই সময় নষ্ট কর্য়্যাছিস্। মা কেঁদে ফেললো।—ক্যানে উয়ারা বুলবে এ্যামুন কর্য়্যা? দশটা লয় পাঁচটা লয়—আমার একটা ব্যাটা তুই,—তোকে সবাই এ্যামুন করবে ক্যানে? বুলবে ক্যানে বল্?

—ওদের কেউ তো আমার পথে আসেনি মা! তাই ওদের এত কথা,—এত রাগ,—এত হিংসে। যাই হোক,—আমি কাল খুব ভোরে উঠে বাড়ী থেকে চলে যাব মা।

—কতি যাবি বেটা?

—যাবো কোলকাতায় মা! সেটা শুনেছি গাইয়ে-বাজিয়ের জায়গা। টাকা কোথায় আছে,—আমি একবার দেখে আসি মা। যদি জীবনে কোনদিন উন্নতি করতে পারি, তোমাকে শুদ্ধ নিয়ে উঠে যাব। এ্যাঁ?

এই বলে পরাশর মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এইখানে পরাশরের সংগীত শিক্ষা নিয়ে একটু কিছু বলা দরকার। গান শেখার পূর্ব্বে পরাশর তবলা শিখেছে, আর শিখেছে সে তার দাদু কুঞ্জর কাছে। কুঞ্জ একদিন রেগে গিয়ে পরাশরকে নিয়ে বসলো। বললো—লে তেবে—তবলা লে! দেখি তোর ক্যামুন ধক্! তেরে কেটে তাকো তাকো, তেরে কেটে তাকো তাকো, তেরে কেটে তাক্, তেরে কেটে তাক্ তেরে কেটে ধা। এই ধায়ের উপর হ'ল শম্। বুঝলি? ইয়্যা হোলো ষোল মাত্রার বোল্। ইয়াতে কাওয়ালীও বাজবে, আবার তিনতালাও বাজবে— বুঝ্লি?

—হুঁ। বললো পরাশর।—তা'পর্?

—তাপর্ আবার কী? ইয়্যাই আগে সেধে লে!

দু'দিনও গেল না। হাট থেকে—বাড়ী ফিরে কুঞ্জ শুনতে পেল, পরাশরের শোবার ঘর থেকে পরিষ্কার হাতের তবলার বোল উঠছে...

সে বোল শিক্ষার্থীর আড়ষ্ট প্রচেষ্টা নয়, শিক্ষকের পাকা হাতের। বাজারের থলেটা নামিয়ে রেখে কুঞ্জ ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো—হ্যাঁ, একমনে পরাশরই তবলা বাজাচ্ছে বটে! মুখের ঘাম না মুছে কুঞ্জ সংগে সংগে বসে পড়লো এবং তবলা বাঁয়া টেনে নিয়ে বললো—লে-লে থপ্ ক'রে একতালাটা মেরে লে। ধিন্ ধিন্ ধা ধা থুন্না কৎতে দাঘে তেরেকেটে ধিন তেটে—'ধিন'। এই ধিনে হ'ল শম্—বুঝলি?— হ্যাঁ, বলে পরাশর নিজের দিকে তবলা টেনে নিয়ে·· বললো--শুন্য়্যা ল্যাও তুমার একতালা।

সেই পরাশর। শুধু তবলা বাঁয়ার ব্যাপারেই নয়, সংগীতের ক্ষেত্রেও তার এই অগ্রগতি অব্যাহত। খাগড়ার যে গুরু তাকে গান শেখাচ্ছিলেন মাস দুয়েকের মধ্যেই তাঁর ভাণ্ডার শূন্য হবার উপক্রম হলো। তিনি পরাশরকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ ক'রে কোলকাতায় তাঁর চাইতে অনেক বড় ওস্তাদের কাছে যাবার জন্য চিঠি লিখে দিলেন।

কিন্তু কোলকাতা কি ভগীরথপুরের মতো ছোট জায়গা? শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে দ্রুত-ধাবমান ট্রাম-বাস-ঘোড়ারগাড়ী-রিক্সা-মোটর লরী আর ভ্যানের দিকে চেয়ে পরাশরের মনে হ'ল—এরা বোধ হয় মানুষের থাকার জায়গাকে ভেঙে চুরে তচ্-নচ্ ক'রে দিয়েছে। যাই হোক ধীরে ধীরে পরাশর রাস্তা পার হ'য়ে ফুট-পাথে গিয়ে উঠলো।

ঠিকানা লেখা কাগজ খানা বার ক'রে একবার দেখলো—ফরডাইস্ লেন। ...অত্যন্ত সন্তর্পণে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে সে বৌবাজার দিয়ে এগিয়ে চ'ললো—ফরডাইস্ লেনের দিকে। চলতে চলতে ভাবছে মনে মনে পরাশর। —কী বিচিত্র দেশ! সবাইকে যেন বাঘে তাড়া করেছে। তার পর মনে হলো—হ'তে পারে আপিসের সময়টা হয়তো বাঘের মতোই।...এরা স্থির হয়ে বসে কখন? আমাদের ভগীরথপুরের লোকজনের মতো কি কথাবার্ত্তা বলে এরা? কী জানি!...ছাতা হাতে এক ভদ্রলোক ছুটছিলেন, তাঁর গায়ে ধাক্কা লেগে একটি বৃদ্ধ পড়ে গেলেন রাস্তার ওপরে। ধাবমান লোকটি মুহূর্ত্ত কালের জন্য থমকে দাঁড়ালেন, তারপর এগিয়ে এসে ভূপতিত বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বললেন—

—এঃ! পড়ে গেলেন বুঝি? সরি! ভেরি সরি!...বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলো পরাশর। কী আশ্চর্য সভ্যতা! তুমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে লোকটাকে, ফিরে এসে বললে—সরি! ব্যস! সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অন্যায় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল! মনে রাগ থাকলেও চেপে যেতে হবে। বৃদ্ধকে পরাশর ধরে তুলতেই তিনি বললেন, থ্যাঙ্কস মাই বয়! এই বলে তিনি লাঠিটিকে কুড়িয়ে নিয়ে আবার আস্তে আস্তে এগোলেন।

এখানে বেশীর ভাগ কথাই ইংরেজীতে বলতে হয়। মেরে বলতে হয়—সরি। মার খেয়ে বলতে হয়—থ্যাঙ্কস। সহরের সভ্যতার এই রকম নিয়ম। এসব তাকেও শিখতে হবে।...বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে বলে—সে কোলকাতায় এসেছে,—এখানকার আদব—কায়দা, রীতি-নীতি না জানলে পদে পদে ঠেকতে হবে—ঠকতে হবে। ঠিক মত চলতে না

পারলে—এখানকার লোকে বলবে—অসভ্য। বলবে—গেঁইয়া। মিছি মিছি এই বিশেষণগুলো ঘাড় পেতে নিয়ে লাভ কি? অত ভুল করবে না পরাশর। সে খুব ভাল করে এখানকার কথা শিখবে, শিখবে এখানকার সহবৎ।...আরে, এইতো ফরডাইস লেন! নম্বরটা কত দূরে হবে?

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে। সুন্দরী...শ্যামা বয়স বছর ষোল কি সতেরো। সে পরাশরের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে পরাশর একটু লাল হয়ে বললো—আমি মুর্শিদাবাদ থেকে আসছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারই তো কথা ছিল আসবার না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আসুন ভেতরে আসুন। বাবা রয়েছেন বাড়ীতে। বলতে বলতে পরাশরকে ভেতরে নিয়ে তরুণী দরজা বন্ধ করলো এবং উঠান দিয়ে ফিরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললো—বাবা, মুর্শিদাবাদের সেই ভদ্রলোক এসেছেন।

—পাঠিয়ে দে আমার কাছে।

—যান! ওই ডান দিকের ঘর। এই বলে তরুণী অন্যদিকে চলে গেলেন। শ্রদ্ধা আর ভয় মিশানো মন নিয়ে পরাশর ঘরে ঢুকলো। গিয়ে দেখলো একটি তক্তাপোষের উপর বসে আছেন—সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধ। বয়স হবে বছর পঁয়ষট্টি। পরাশরকে দেখবা মাত্র তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হেসে বললেন—বসো বাবা, বসো। ওরে মিনু! আমাদের দু'কাপ চা দে। মিনু—মানে মিনতি আমার মেয়ে। সংসারে আমার ছেলে বলো, মেয়ে বলো—ওই একটি। আর কোথাও কেউ নেই।...ওর মা যখন মারা যান, তখন ওর কতো বয়স? এই

বছর আষ্টেক হবে! তখন আমি ওকে রান্না ক'রে খাইয়েছি, এখন ও রান্না ক'রে আমাকে খাওয়ায়! ও! ভাল কথা, তোমারতো থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে! আচ্ছা হচ্ছে, সে সব হচ্ছে। আসুক মিনু চা নিয়ে। সব ঠিক করে দিচ্ছি। তারপর বলো, তোমার খবর বলো, গণেশ কেমন আছে?...আমরা দুজনে হোলাম গুরুভাই। দুজনেই— আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ছাত্র। শুনেছ খাঁ সাহেবের গান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী গান শুনেছো?

—যমুনাকা তীর। আর—

—ইয়া! ও জিনিষ আর হবেনা। ওঁর মধ্যেই আরম্ভ, ওঁর মধ্যেই শেষ। কত বড় সাধক! এই বলে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হাত তুলে নমস্কার করলেন তিনি। তারপর আবার খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন জানালা দিয়ে শূণ্যপথে। যেন ফেলে-আসা দিনগুলির মহাশূণ্য বেয়ে তাঁর স্মৃতি দুই ডানা মেলে উড়ে চলেছে মানস-গামী বলাকার মতো— চোখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল একটু যেন ভিজে ভিজে।

এইবার এতক্ষণ পরে পরাশর তার গুরুর চিঠিখানি বৃদ্ধের হাতে তুলে দিল; বৃদ্ধ খামখানি ছিঁড়ে পাশ থেকে নিকেল ফ্রেমের চশমাটা তুলে চোখে দিলেন তারপর ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়তে সুরু করলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যেতো চিঠি পড়তে পড়তে তিনি দু' তিনবার পরাশরের মুখের দিকে চেয়ে নিলেন। তক্তাপোষের আর এক প্রান্তে বসে হাত দিয়ে বিছানার চাদরটাকে সমান করতে লাগলো পরাশর। চা নিয়ে মিনতি ঢুকতেই বৃদ্ধের যেন সম্বিত ফিরে এলো। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন—মিনু! আজ থেকে এই ছেলেটি—তোমার নামটা যেন কি বাবা?

—পরাশর দাস।

—হ্যাঁ, আজ থেকে পরাশর আমাদের এখানেই থাকবে। তোর ঘরটা ওকে ছেড়ে দে—তুই আমার ঘরে থাকবি। ও আমার গুরুভাই গণেশের ছাত্র—আরে! তোর গণেশ কাকা, খাগড়ায় থাকে—

—ও! হ্যাঁ।

—সেই পাঠিয়েছে ওকে গান বাজনা শিখতে। ভালই হ'ল, কী বলিস? আমাদের বাড়ীতেও লোকজন নেই—তোরও একটা সংগী জুটলো? হ্যাঁ, ভাল কথা, কী রকম কী নিয়েছ বাবা গুরুর কাছ থেকে বল দিকিনি এবার? পরাশর...

ঠিক এইখান থেকে পরাশরের জীবন নতুন দিকের সন্ধান পেলো। মিনতি আর তার বাবার এই ছোট সংসার। দিবারাত্রি সেখানে সংগীতের স্রোত বইছে। নিজের বিদ্যাবত্তার অনেকখানি তিনি কন্যাকে দান ক'রেছেন ফলে মিনতিও সংগীতে পারদর্শিনী। গুটি চারেক ছাত্র সপ্তাহে তিন দিন ক'রে আসে, আর আসে রাত্রি নামে আর একটা বড়লোকের মেয়ে—গান শিখতে। এরা সবাই মিলে যে প্রণামী দেয়, তাতেই চলে বৃদ্ধ রামলোচনের সংসার। দুধ ঘি হয়তো তাঁদের প্রত্যেক দিনের আহার্যে সংযুক্ত হয় না, কিন্তু দুবেলা দুটো মোটা ভাত ও দু'খানা মোটা কাপড়ের যোগাড় ওই পয়সা থেকেই হয়।

পরাশরকে গান শেখাতে গিয়ে রামলোচন অবাক হ'লেন। সুর যেন তার কণ্ঠে দুরন্ত শিশুর মতো হাত পা মেলে খেলা করে। যেখানে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে সে সুর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে। এই ছাত্রকে গুরু রামলোচন যেন দান করবার নেশায় মেতে উঠলেন।

প্রতিদিন দু'খানা তিনখানা ক'রে নতুন খেয়াল, চারখানা পাঁচখানা ক'রে ঠুংরী তার সমস্ত কারুকার্য্য সমেত পরাশর হজম করে ফেলতে লাগলো। শুধু তাই নয়, সে যখন ফিরে এই গান গুরুকে শোনায়, তখন তিনি স্তব্ধ হতচকিত ও সমাহিত হ'য়ে এই প্রিয়দর্শন ছাত্রটির দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর চোখের কোণে দেখা দিয়ে জলের রেখা। এইভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর রামলোচন একদিন পরাশরকে ডেকে বললেন—

—তোমাকে দান ক'রে আমি সর্বস্বান্ত হ'য়েছি, সে আমার গৌরবের। এখন তোমাকে পাঁচজনে খাতির করছে, আদর করছে, এটা দেখে যেতে পারলেই এ'বারকার মতো আমার ছুটি। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় বেঁচে আছি।

—আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, যেন আপনার নাম রাখতে পারি।

—পারবে, তুমিই পারবে। শোন, আর একটা কথা বলি, আমার বয়স হ'য়েছে। ইচ্ছে থাকলেও আর বেশীক্ষণ এক সংগে বসে গান শেখাতে পারিনা। অতএব আজ থেকে এই সব ছাত্র ছাত্রীদের তুমিই গান শেখাবে। আজ থেকে তুমিই এদের গুরু।...এই বলে মিনতি ও রাত্রিকে ডেকে অন্যান্য ছাত্রদের কাছে এই খবর দিয়ে দিলেন।...সেই দিন থেকে ঢুলী পরাশর গুরু পরাশরে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। গান শেখাবার ভার নিয়েই পরাশর মন দিলে মিনতি ও রাত্রির দিকে। দুজনেই রূপসী, দুজনেই প্রতিভাময়ী, দুজনেই শিক্ষার আগ্রহে বেগবতী, কিন্তু তবু যেন দুজনের মধ্যে কোথায় একটা ব্যবধানের প্রাচীর আছে। মিনতি সেবাপরায়ণা, সমর্পিতা, সূর্যমুখীর মতো পরাশর-অভিমুখী। কিন্তু রাত্রি যেন বিদ্যুৎশিখা, আপন ঔজ্জ্বল্যে

আপনি উদ্ভাসিতা। মিনতি পথ চলে চারিদিকে চেয়ে সন্তর্পণে, আশেপাশের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটিকে সযত্নে লক্ষ্য ক'রে, স্পর্শ ক'রে, কিন্তু রাত্রির দৃষ্টি—দূরে, বর্তমানের সীমানা পেরিয়ে। একজন মন্দগামিনী অন্যজন মদগর্বিতা। অবশ্য তার একটু কারণও ছিল। রাত্রির বাবা হচ্ছেন, বড়লোক। ওই তাঁর একমাত্র মেয়ে। ফলে—তাকে সংসারে তাঁদের অদেয় কিছু নেই। মিনতি এবং রাত্রি দু'জনেই ষোড়শী; এবং তাদের গুরু পরাশরের বয়স তখন বছর বাইশ বড় জোর!

তবু—

খুব লক্ষ্য করলে দেখা যায়,—আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি মেলে রাখলে হয়তো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে বোঝা যায়,—পরাশরের পক্ষপাতিত্ব যেন রাত্রির দিকেই। কোন নতুন সুরের বিন্যাস শিক্ষা দেবার সময় যেন মিনতির চাইতে রাত্রিকে শেখাতে একটু বেশী সময় লাগে তার। কিন্তু এ জিনিষ আমাদের চোখে পড়লেও—মিনতির চোখে পড়ে বলে তো মনে হয় না। কেননা তার দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি যে এই ব্যাপারে একটুও হোঁচট খেয়েছে, তাতো বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই।

সেদিন রাত্রি সন্ধ্যার পরে পরাশরের কাছে বসে শুধ্-কল্যাণ শিখছে। গাইতে গাইতে এক সময় রাত্রি বললো—মা একটা কথা বলছিলেন। পরাশরের মন তখন কল্যাণের মাধুরীর ক্ষেত্রে বিচরণ করছিল, ফলে রাত্রির কথা তার কানে গেলনা। একটু অপেক্ষা ক'রে রাত্রি আবার ডাকলো—

—মাষ্টারজী?

—উঁ! এ্যাঁ? আমায় কিছু বলছো?

—হ্যাঁ। বলছি,—আমার মা বলছিলেন যে তিনি বেঁচে থাকতে কি একবার আপনাকে দেখতে পাবেন না ?

—কেন ? কেন ? একথা কেন ? আমি কি কোন অপরাধ করেছি ?

—তাই কি বল্লাম ?

—আমার মা আপনাকে একবার দেখতে চাইছেন। আমার গুরুকে দেখবার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

—ছি ছি। আমি তোমার গুরু কে বল্লে ? তোমার গুরু হচ্ছেন—

—আপনিই আমার গুরু। তাঁর কাছে আমি নাড়া বেঁধেছি—একথা ঠিক। কিন্তু শিক্ষা পেয়েছি কতটুকু ? আমি তো আপনারই সৃষ্টি মাষ্টারজী !

ঝি—ম্ ক'রে উঠলো পরাশরের মাথার মধ্যে। রাত্রির কথার মধ্যে এই লাবণ্যের স্পর্শ এতদিন কোথায় ছিল ? কোথায় ছিল রাত্রির চরিত্রের এই আর একটা দিক ? যেখানে ও বিনীতা, বিনম্রা—এবং তদ্গতা ?

—মাষ্টারজী !

এই ডাকে পরাশর চেয়ে দেখলো দু'টো দীর্ঘায়ত চোখ তার দিকে ব্যগ্র-ব্যাকুল আগ্রহে চেয়ে আছে ! পরাশর ফিরে চাইতেই রাত্রি তার দু'টি হাত দিয়ে পরাশরের ডান হাতখানি সজোরে চেপে ধরলো।

—আমাকে আপনার বড় ক'রে দিতেই হবে ! যাতে সমস্ত ভারতবর্ষে আমার চাইতে বড় গাইয়ে আর কেউ না থাকে, এটুকু আপনাকে ক'রে দিতেই হবে। জীবনে এর চাইতে বড় কামনা, বড় স্বপ্ন আর আমার নেই। বলুন মাষ্টারজী,—আপনি রাখবেন আমার এ অনুরোধ ?

পরাশর আবার চাইলো রাত্রির দিকে। সুকঠিন প্রতিশ্রুতি দাবী করছে প্রিয়-শিষ্যা। এ দাবী পূরণ করা কি সহজ কথা ? ক'টা শিক্ষক পারেন

তাঁর শিষ্যাকে এইভাবে যশের সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠা করতে? কিন্তু,— সংগে সংগেই পরাশরের মনে হ'ল—ক'টা শিক্ষকের জীবনেই বা জোটে এমন সর্ব্বগুণান্বিতা ছাত্রী?
পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে সমস্ত পরিস্থিতিকে যেন অবাস্তব ক'রে তুলেছে। দূরে কোন্ বাড়ীতে শঙ্খ বাজছে। প্রতিশ্রুতির জয়ধ্বনি যেন। পরাশরের হাত ধরা রাত্রির হাতের তালু ঘেমে উঠ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে... বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে পরাশরের মাথার মধ্যে। রাত্রির মুখের দিকে চেয়ে সে কম্পিত গলায় বললো...
—তাই হবে। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি রাত্রি—ভারতবর্ষের সংগীত-রসিকদের কাছে তোমাকে আমি প্রতিষ্ঠা করবো। আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরবো, প্রত্যেক জায়গায় বিরাট গানের আসর করবো, যতক্ষণ না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়...
অভিভূতা রাত্রি পরাশরের পায়ের ধূলো নেবার জন্য যেই হাত বাড়িয়েছে, অমনি পেছন থেকে শোনা গেল মিনতির কণ্ঠ,—তোমার আর রাত্রির জন্যে দু'কাপ চা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি পরাশরদা!
...বিদ্যুদ্বেগে দুজনেরই মুখ ঘুরে গেল মিনতির দিকে। আশ্চর্য! ওর উপস্থিতির কথা একবারও মনে হয়নি কারো! মিনতি ধীরে ধীরে, এগিয়ে গিয়ে চায়ের পেয়ালা দু'টি তক্তাপোষের উপর নামিয়ে রাখলো... তারপর যাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে বললো...
—বাবার শরীরটা আজ খুব খারাপ হয়েছে পরাশর দা'—যদি পারো, তবে সময় করে একবার তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে এসো... কেমন?
সত্যিই কিন্তু শরীর খারাপ হয়েছিল রামলোচনের। এত খারাপ হয়েছিল যে এই শোয়া থেকে আর বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতে পারলেন

না। মেয়ে মিনতির ভীরু হাত দুটি কোন রকমে পরাশরের হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তিনি চোখ বুঁজলেন। দেশ থেকে একটি দিক্‌পাল গাইয়ের তিরোভাব ঘটলো…

পরাশর যেন নূতন ক'রে পিতৃশোক অনুভব করলো। দু'বছরের উপর সে এখানে এসেছে। এসে সে একদিনের জন্যও অনুভব করেনি যে এটা তার নিজের বাড়ী নয়, সঙ্গীত শিক্ষকের বাড়ী। কিন্তু তবু জোর গলায় একথা পরাশরকে বলতেই হবে—স্নেহের এমন কুলপ্লাবী রূপ সে নিজের বাড়ীতেও দেখেনি। নিঃশব্দে বসে রইল পরাশর মৃত গুরুর পায়ের তলায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিনতি। হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়ার কান্না…অনেকক্ষণ পরে পরাশর মিনতির দিকে চেয়ে বল্লো—কাঁদবার জন্য অনেক অবসর পাওয়া যাবে মিনু। আপাততঃ পিতার সৎকার আমাদের প্রথম কাজ। এসো, সেই কাজ আমরা শেষ করি।…তৎক্ষণাৎ বাধ্য মেয়ের মতো মিনতি উঠে বসলো, দু'চোখ মুছে চাইল পরাশরের দিকে। কুণ্ঠিত গলায় পরাশর বল্লো—ঘরে কি টাকা পয়সা কিছু আছে? না রাত্রির কাছে যাব একবার? মিনতি ধীরপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একশোটা টাকা এনে পরাশরের হাতে দিল…

গুরুদেবের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। শুধু কি দেহই পুড়ছে রামলোচনের? ওই সঙ্গে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে কত রাগ, কত রাগিণী, কত বিচিত্র সুর ও স্বরের প্রবাহ, কত তান, কত বাট, কত লয়, গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনার ঐন্দ্রজালিক সমারোহ। আজ মনে পড়ে আর একটি মৃত্যুর কথা। তার দাদু কুঞ্জ! ওঃ! কতদিন

পরে আজ তাঁকে মনে পড়লো পরাশরের। সরল, উদার, সত্যবাদী কুঞ্জ। উঠানের শিউলী গাছটায় দুচারটে শিউলী যেই দেখা দিল, সংগে সংগে কুঞ্জ যেন পাগল হয়ে উঠলো—

—ছেল্য়্যা পিল্য়্যারা সব তৈয়ারী হয়্যা লে রে! ঢাকের চামড়াটা দেখ্য়্যালে,—কাঠিগুল্য়্যা চেঁছ্য়্যালে,—কাঁসি টাসি মেজ্য়্যালে!—এবার ভাবছি পঞ্চমীর দিন বিহানেই ঠাকুর মশায়ের ছিচরণে গিয়্যা পঁহুছাব: —এই বলে উবুড় হয়ে শিউলী কুড়োতে কুড়োতে সে নিজেই গান ধরে দেয়,—মাগো তুমি আস্ব্যা বোল্য়্যা রিদয় পদ্দ পেত্য়্যাছি আজ—সেই পদ্দে চরণ রেখ্য়্যা ঘুচাও মানব জনম লাজ॥ মাগো—তুমি আস্ব্যা বোল্য়্যা—ওরে পরাশ্য়্যা! শিউলী কটা লিয়ে যাতো! লিয়ে গিয়ে ও পাড়ার ঠাকুর বাবাকে দিয়ে আয়, লারায়নের পূজ্য়্যায় লাগবে। মাগো তুমি আস্ব্যা বোল্য়্যা রিদয়-পদ্দ পেত্য়্যাছি আজ—শুনছো গো পরাশ্য়্যার দাদী!

—বোলোনা ক্যানে! রান্নাঘর থেকে কর্ম্মরতা কুঞ্জর স্ত্রীর গলা ভেসে আসে।

—বাংলার মন্দিরের মা দুগ্গা,—যত দিন যেছে—ততই য্যানে জাগ্গতো হোয়্যা যেছে। আর বছরের কাণ্ড দেখে 'মা' 'মা' কোর‍্য়্যা চিল্হিয়ে মরি! হরিচরণ বাবা পূজ্য়্যা করতে এস্য়্যা সেদিন মথো বাবাকে বুললে— জানো মথো! মায়ের এই অকাল বোধনে সব রকম ফল-ফুল্য়্যারী পাওয়া যাধুর—ও পাওয়া যায়না কী—বোলোধিনি?

—কী? মথোবাবা শুধালো।

—খরমুজ। খরমুজ যদি পাওয়া যেতো—তাহলে বোধ হয় এই পূজ্য়্যা সব্বাংগোসুন্দর হতো।—আমও পাওয়া যায়—কাঁঠালও ঢুঁড়লে পাওয়া

যা—য়, কিন্তু খরমুজ—হুঁ হুঁ বাবা ! উয়া হোচ্ছেনা !—এই পর্য্যন্ত বলে কুঞ্জ আবার গান ধরলো—সেই পদ্দে চরণ রেখ্য়্যা ঘুচাও মানব জনম লাজ। মাগো তুমি আস্ব্যা—

—তাবাদে কী হল বুল্ছোনা ক্যানে ? কুঞ্জর স্ত্রীর গলা শোনা গেল।

—তারপরই তো লেগ্য়্যা গেল—লাগ্ড্যাঙ্গয়্যা —ড্যাং-ড্যাড্যাং ড্যাং পূজ্য়্যায় বোস্য়্যা হরিচরণ বাবা খালি বুলছে—মথো ! আমি খরমুজের গন্ধ পেছি ক্যানে ?—মন্দির শুদ্ধ্যা সব লোক হেস্য়্যা উঠলো। বুললো ভট্‌চাজ মাশায়ের মাথা খারাপ হয়্যা গিয়্যাছে। খরমুজের কথা বুলতে বুলতে গন্ধও নাকে এস্য়্যা গেল ? হঁ্যা, ভট্‌চাজ মাশায়, খোরমুজ কি পিরথিমিতে এখুন হয় ?...তাও হরিচরণ বাবা বুলছে—ওহে তোমরা খুঁজয়্যা দেখ—আমি যে পষ্ট খোরমুজের গন্ধ পেছি ! যাহোক সবাই মিল্য়্যা খুঁজতে লেগ্য়্যা গেল। খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে ত্যাখে কী ছাদের উপরকার পাতা টাতা পরিষ্কার কোর্য়্যা যেখানে আগেরদিন রাখা হয়্যাছে, সেইখানে এক লতানে গাছের শেষে একটা খোরমুজ পেক্য়্যা একেব্যারে টুস্ টুস্ করছে।—তার গন্ধ কি গো পরাশ্য়্যার দাদী ! টপ্ টপ করে কুঞ্জর চোখের জল তার লোমশ বুকের উপর পড়ে—কাজ ভুলে গিয়ে অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকে শরতের আকাশের দিকে—যেখানে একখণ্ড সাদা মেঘ আর একটি খণ্ড মেঘের সংগে কোলাকুলি করে পূর্ব্বদিকে যাচ্ছে সূর্য্য-প্রণাম করতে।...চিতার আগুণের আভা পড়েছে পরাশরের মুখে—ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশের চেহারা হয়েছে মিনতির। থম্ থম্ করছে যেন; ভিজেভিজে ভাবটা এখনো কাটেনি, যে কোন মুহূর্ত্তে বর্ষণ সুরু হতে পারে। হঁ্যা, বাংলা মন্দিরের সে খরমুজ খেয়েছে পরাশর। অপূর্ব্ব সুন্দর পাকা টুস্ টুসে খরমুজকে কাটতে রাজী হলেন না হরিচরণ, সেটাকে টাঙিয়ে

রাখা হল মন্দিরের সামনে। পরে সন্ধিপূজোয় ভোগ দিয়ে কুচি কুচি করে প্রত্যেককে প্রসাদ দেওয়া হল। আচ্ছা—মানুষের জীবনও কী ওই খরমুজের মতো নয়? গাছ যেমন সারাজীবন মাটি থেকে, রস আহরণ করে, ফলের সুপক্কতার মধ্যে নিজের জীবনের সার্থকতার পথ খোঁজে, তেমনি মানুষও কি অন্নের দ্বারা খাদ্যের দ্বারা পরিপক্ক, প্রাণ নামক ফলটি, মৃত্যু নামক মহাদেবতার চরণে উৎসর্গ করে ধন্য হয়না? ওই একটি মাত্র মহাদেবতা দেশ কালের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে যুগ-যুগান্তর ধরে জগতের অনুতম কীটানুকীট, জড়লতা-গুল্ম-অরণ্য এবং মহত্তম মানুষের কাছ থেকে ওই একই পূজা কি গ্রহণ করছেন না?—দেহ নামক পত্র, প্রেম নামক পুষ্প এবং প্রাণ নামক ফল—?

ধীরে ধীরে গুরুদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে অগ্নি দেবতার আলিঙ্গনে। কী হবে এবার পরাশরের? কোন পথ? ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই থাক, আপাততঃ মিনতিকে দিয়ে শেষ কৃত্য করানো দরকার! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পরাশর। কুঞ্জকে যখন পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে, তখন কাঠগুলো ভিজে ছিল বলে ধরে উঠতে একটু দেরী হয়েছিল। তারপর আগুন জ্বলে ওঠে আধ ঘণ্টার মধ্যে লেহন করে নিয়েছিল কুঞ্জের নর সত্বা। মিনতির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল পরাশর। মিনতি স্থির চোখে চেয়ে আছে চিতার দিকে, রুক্ষ চুল গুলি বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে—সর্ব্বহারা নারীমূর্ত্তি। যেন তপস্যা নিরতা। ডাকলেই হয়তো ধ্যান ভেঙ্গে যাবে ওর। তবু পরাশর আস্তে আস্তে ডাকলো—মিনু!

মিনতি মৃদু গতিতে মাথা তুলে পরাশরের দিকে চাইলো। দৃষ্টির মধ্যে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই! নিঃসংগতার ছায়া পড়েছে ওর চোখে।—

—শেষ হয়ে যেতে আর দেরী নেই। কিছু কাজ যে বাকী আছে মিনু।
—করছি! বলে মিনতি উঠে দাঁড়াল!

সব চাইতে মজা হল এই যে, রামলোচনের মৃত্যুর পর পরাশর দেখতে দেখতে দেশ বিখ্যাত হয়ে পড়লো ট্রামে-বাসে-ট্রেনে-পথে-রেস্তোরায় সর্ব্বত্রই পরাশরের গান নিয়ে আলোচনা। কিছুদিন থেকে রেডিওতে আর গ্রামোফোনে পরাশর যে আধুনিক গান গাইতে স্থরু করেছে—তা নিয়ে তোলপাড় চলছে দেশে! শেষকালে এমন অবস্থা এল—যখন মুটে-মজুর-কুলী-মুদ্দফরাসের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরতে লাগলো পরাশরের গান। সংবাদপত্রে মাসিকে সাপ্তাহিকে সর্ব্বত্র তার ছবি ছাপা হ'তে লাগলো; এক কথায় তার গান গাইবার বিশেষ ভংগিটি নিয়ে সমস্ত দেশে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হলো। দলে দলে লোক এসে ভীড় করতে লাগলো রামলোচনের বাড়ীতে। শেষে—দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায়ই এসে পেঁছিলো, যখন লোকজন রাস্তায় কিউ দিয়ে দাঁড়াতে স্থরু করেছে। মিনতির মতো সর্ব্বংসহা মেয়ে প্রথম প্রথম এতে উল্লসিত হলেও শেষ কালে বিরক্তি বোধ করতে লাগলো! অথচ পরাশরকে এ সব বন্ধ করতে বলাও তার সাধ্যাতীত; ফলে সে চেষ্টা করতে লাগলো যাতে এই বাড়ী ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে! স্থযোগ জুটতে খুব বেশী বিলম্ব হল না,—ইন্দ্রানী মেমোরিয়াল মিউজিক্ স্কুলে এ্যাসিষ্টাণ্ট হেড্‌মিষ্ট্রেসের পদটি পেয়ে সে স্কুলের বোর্ডিংয়ে উঠে যাবার আয়োজন করলো।
সেদিন সকালে উঠে সে স্নান করলো। তৈরী করলো পরাশরের চা আর হালুয়া। তার পর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুর ঘরের

দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভোরবেলায় স্নান সেরে পরাশর ঘণ্টাখানেক গিয়ে ঠাকুর ঘরে বসে,—এই সময় দরজা থাকে বন্ধ, ফলে কেউ জানেনা সে ঠাকুর ঘরে কি করে।...একটু পরেই পরাশর বেরিয়ে এল—ধ্যানের রসে মদির তখনো তার আরক্ত দুটি চোখ। দরজার কাছে অপেক্ষমানা মিনতিকে দেখে সে একটু অবাক হলো।

কিন্তু মুখে কিছু না বোললেও অল্প একটু হেসে চা আর হালুয়ার বাটিটা হাত থেকে নিয়ে বললো, কী ব্যাপার ? খাবার নিয়ে আজ একেবারে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ?

—অনেক দিন তো দিতে পারবো না, আর তাই আজ এগিয়ে এসে দিলাম।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ ইন্দ্রাণী মেমোরিয়াল মিউজিক্ স্কুলে এ্যাসিষ্টান্ট হেড্‌মিষ্ট্রেসের চাকরি পেয়েছি, কাল থেকেই ওদের বোর্ডিংয়ে থাকতে হবে গিয়ে।

অত্যন্ত অবাক হয়েছিল পরাশর: কিন্তু উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তার জীবনে একেবারেই নেই, তাই শুধু অস্ফুট গলায় বললো—ওঃ! একটু খানি চুপ করে চা টা এক চুমুকে খেয়ে আস্তে আস্তে বললো—তাহলে এবাড়ীটার ভাড়া মিছি মিছি গুণে লাভ কী ? এটাকে ছেড়ে দেওয়া যাক !

—বারে ! আমি থাকবো না বলে তুমিও কি এবাড়ীতে থাকবে না ?

—এই এত লোকজন ছাত্র টাত্র এরা বোসবে কোথায়—

—এতকাল যেখানে বসেছে !

—কিন্তু, ঢোঁকগিলে বললো পরাশর।

—না তুমি এইখানেই থাকবে। এগুলো আমার ওপরে রাগ নয় ?

—রাগ!

—রাগ নয় তো কি? আমি একটা চাকরী পেয়েছি, সেখানে যদি আমাকে কাজের খাতিরে উঠে যেতেই হয়, তাই বলে তুমিও এবাড়ী ছেড়ে দেবে নাকি?

—রাগ নয় মিনু! শান্ত কণ্ঠে বললো পরাশর।—কিন্তু তোমার বাড়ীতে তুমি থাকবে না, অথচ আমি সেখানে রাজত্ব করবো কিসের দাবীতে?

—বাজে বোকোনা পরাশরদা! যে দাবীতে বাবা তোমাকে এক কথায় নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন! যে দাবীতে তিনি তাঁর ইহকালের যথা সর্ব্বস্ব এমন কি তাঁ'র যুবতী মেয়ের সম্ভ্রম পর্যন্ত তোমার হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেছেন—সেটা কি একটা খুব সহজ দাবী? চুপ করে থেকো না বলো! আমি কি অন্যায় কিছু করেছি? তুমিই বলো? এখানে বসে বসে তোমার অন্ন মুখে দেব, অথচ আর্থিক দিক দিয়ে তোমাকে কোন সাহায্য করবোনা! এই কিছু না করাকে তুমি ভাল বলো? আমি বাবার কাছে, তোমার কাছে, যা গান শিখেছি, যদিও তা খুব সামান্য, তবু তা'দিয়ে অনায়াসে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবো।—হ্যাঁ পারবে। বেশ তাই কোরো। এর পর থেকে মাসে মাসে আমাকে সাহায্যই কোরো তুমি। কত টাকা করে দেবে?—যা পারি! যা আমার সাধ্যে কুলোয়—তাই দিও। আমার খাওয়া দাওয়ার লিষ্টিতে এবার থেকে রাবড়ীটা যোগ করে দেবো! কেমন? এই বলে সিঁড়ি দিয়ে পরাশর নেমে গেল বাইরের ঘরের দিকে! কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মিনতির সেই দিকে চেয়ে একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়তে দেখা গেল! ধীরে ধীরে সে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে ······

পরাশরের এই অভাবিত সাফল্যে মিনতি অত্যন্ত আনন্দিত হলেও আর একজনের মনের খবর আমরা এখনও নিইনি! সে হচ্ছে রাত্রি। পরাশরকে সে এইরূপে দেখতে চায়না! যে দিন পরাশর এই বাড়ীতে প্রথম এল, সেই ভীরু লাজুক গায়ক পরাশর, কুমারী মিনতির অন্তরের ধ্যানে সেই রইল চিরজীবি হয়ে! পিতার মৃত্যুর পর কতদিন কত রাত্রি কেটে গেছে মিনতির একটা স-ভীত সানন্দ প্রতীক্ষায়, তার কোন লেখা জোখা নেই। কিন্তু, না। মিনতির জীবনে সে রকম রমণীয় পরিবর্ত্তন কিছু ঘটেনি। ধীরে ধীরে প্রত্যাশার তীক্ষ্ণতা রূপান্তরিত হয়ে গেছে ব্যর্থতার বেদনায়। সেকি তার মনে কোন রকম ছাপ রেখে যায়নি! গেছে বইকি! তাইতো আজ মিনতি চলে যেতে চাইছে পরাশরের জীবন রঙ্গমঞ্চ থেকে! কী রকম করে জানা নেই, এই ধারণা মিনতির মনে বদ্ধ মূল হয়ে গেছে যে, সে উপস্থিত আছে বলেই রাত্রি সেখানে প্রবেশ করতে পারছেনা। সে পরাশরদার মন জানে! সে মন এত বড়, এত প্রশস্ত যে—সেখানে অনায়াসে একটী মেয়ের প্রচুর জায়গা হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, সে মেয়ে মিনতি নয়। সেইদিন বিকালেই রাত্রি যখন এল গান শিখতে, মিনতি তখন তাকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ীর আর এক ঘরে! দরজা বন্ধ ক'রে তার হাত দুটি ধরে বললো—কাল সকালে আমি বোর্ডিংয়ে চলে যাচ্ছি রাত্রি!

—সে কি! কেন ভাই?—একটা চাকরী পেয়েছি। বা! বেশ মজাতো! কে থাকবে তাহলে এবাড়ীতে? কেন পরাশরদা! তুমি! তুমি এসে এখানে থাকবে রাত্রি? পরাশরদার পাশে? তার দিনের সঙ্গিনী আর রাত্রের সহচরী হয়ে! থাকবে?—মানে, আমি বলছি তুমি এসে

পরাশরদাকে বিয়ে করো রাত্রি! আমি জানি! এবং ঠিক জানি, তিনিও তোমায় ভালবাসেন। তাছাড়া—মিনতি কথা শেষ না করতে পেরে রাত্রির দিকে চেয়ে রইল! রাত্রি এমন ভাবে মিনতির দিকে চেয়ে ছিল যেন সে কারো মুখে একটা অলৌকিক গোয়েন্দা কাহিনী শুনছে। মিনতির থেমে যাবার পরও এক মিনিট কেটে গেল এভাবে। অনেক্ষণ পরে রাত্রি বললো—

—তোমার কথা শুনে এতই অবাক হয়েছিলাম যে তা' বলবার নয়। মাষ্টারজীর সংগে আমার বিয়ে কি তোমারই উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, না—কেউ বলেছে এমন কথা ?—

—না কেউ বলেনি আমিই বলছি!

—ওঃ! তুমিই বলছো! এই বলে রহস্যময় হাসি হেসে রাত্রি পরাশরের ঘরেব দিকে চলে গেল। গিয়ে দেখলো জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে পরাশর।

ম্লান বিষন্ন চোখের দৃষ্টিতে অসহায়তা! রাত্রি যেন আজ একটু বেশী কাছে বসলো পরাশরের! মিষ্টি গলায় বললো—কী হয়েছে মাষ্টারজী ?

—না, কিছু হয়নিতো!

—তবে কি ভাবছিলেন এত আকাশের দিকে চেয়ে ?

—ভাবছিলাম কাল্‌কে মিনু বোর্ডিংয়ে চলে গেলে আমার অবস্থাটা কি হবে ?

—কী আবার হবে ? আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবেন!

—তোমাদের বাড়ী ?

—হ্যাঁ! আপত্তি আছে ?—

আপত্তি—এই বলে পরাশর রাত্রির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। বোঝবার চেষ্টা করলো, রাত্রির এই কথার মধ্যে কোন রকম দয়ার ভঙ্গী আছে কিনা! কিন্তু রাত্রি রহস্যময়ী, সহর কোলকাতার অত্যুগ্র আধুনিক সভ্যতার দান সে। তার কথার মর্ম্মার্থ ভেদ করা কি কুঞ্জ ঢুলীর নাতি পরাশর ঢুলীর কাজ?

—আমাকে কি অবিশ্বাস করছেন মাষ্টারজী?

—কেন?

—এই আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি বলে?—না সেজন্য নয়!—তবে?

—তোমার বাপ মার সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিয়ে আমাকে কথাটা বললে ভাল করতে নাকি?—

—বাবা মার সংগে আমার পরামর্শ করাই আছে! আপনি কালকেই চলুন আমাদের বাড়ীতে!

—যাব।

এতদিন পরে সত্যিই ছাড়াছাড়ি হলো! মিনতি চলে গেল হোষ্টেলে, পরাশর গিয়ে উঠলো রাত্রিদের বাড়ীতে, একেবারে বড়লোকী ব্যবস্থার মাঝখানে! স্বতন্ত্র একখানি ঘর তাঁরা ছেড়ে দিলেন। সাজিয়ে দিল সে ঘর রাত্রি মনের মতো ক'রে, তার শিল্পী মাষ্টারজীর জন্য!

এইখানে এসে পরাশরের সুরু হল নূতন জীবন! প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে ছাত্রীকে নিয়ে বসে গান শেখাতে। কোন কোন দিন রাত্রি বারটা একটাও বেজে যায়। মা এসে তাগাদা করেন, সময় সময় ঠাট্টাও করেন যে দুজনে মিলে উপোস করে গান করার যে কি আনন্দ—তা'তিনি বুঝতে পারেন না। সলজ্জ হাসিতে রাত্রি আড় চোখে যায় পরাশরের দিকে, ভিতরে ভিতরে পরাশর কী একটা অস্বস্তি বোধ করে! ঠিক

কি রকমের একটা অনুভূতি, তা'সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। কিন্তু কি রকম যেন একটা ঝিম্ ঝিম্ করা অবসাদময় অনুভূতি। আজকাল এইরকম হয়েছে! রাত্রি কাছে এলেই টয়লেটের একটা ফিন্‌ফিনে সুবাসে ঘরের বাতাস ভরে যায়। গান শেখাতে শেখাতে পর্দ্দা ভুল করে পরাশর! এই ঈষৎ অন্যমনস্কতা রাত্রির চোখ এড়ায় না! সে ঠাট্টা ক'রে বলে, মাষ্টারজীর মন আজকাল হাওয়া খেতে যায় কোথায়?—

—মানে? ধরা ধরা গলায় বলে পরাশর।

—মানে, সুর যার বিনা মাইনের চাকর—তার কেন এই ভুল?

—না না তা নয়। অন্য কথা ভাবছিলাম! মানে, অনেক দিন পরে বাড়ীর কথা,—বাড়ী? বাড়ীতো আপনার নেই বলেছেন মাষ্টারজী!

—ও হ্যাঁ। পরাশর আবার দম নেয়। কিছুতেই সে তার সত্যিকার পরিচয় দিতে পারেনা এদের। গুরুদেবের পরিচয় পত্রে ছিল পরাশর দাস! তাই দাসই রয়ে গেল পরাশর।

সেদিন পরাশর রেডিয়ো প্রোগ্রাম করতে গেছে, রাত্রি বসে আছে তার শোবার ঘরে। ঘোষণা হলো "এবার শ্রীপরাশর দাস আপনাদের একখানি গযুক্ত আধুনিক গান শোনাচ্ছেন, যার প্রথম লাইন হচ্ছে কেন বলো আমি পারি না তোমারে বলিতে"! গান সুরু হলো—সেতো গান নয়, যেন মর্ম্মভাঙা আকুল আবেদন। অব্যক্তকে গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অসহনীয় প্রচেষ্টা। আচ্ছা, কাকে লক্ষ্য ক'রে মাষ্টারজীর এই গান? যে গান প্রথম প্রেমের ব্যথায় রাঙানো? কে লক্ষ্য? আমি? না মিনতি? ভাবে রাত্রি।

…ওদিকে মিনতি তার শোবার ঘরে বালিশে মাথা রেখে ওই গান শুনে

চোখের জল ফেলে। তার মন বলে,—জানি, জানি ওগো কঠিন তাপস! গান গেয়ে পৃথিবীর লোকের চোখ ভিজিয়ে নিজের ব্যথায় তুমি প্রলেপ দিতে চাও? কিন্তু আমার কাছে তোমার এ কান্নার কোন অর্থ নেই। যে রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে তোমার দিন আর রাত্রি, তোমার অস্তিত্বের আবর্ত্তন, তাকে তুমি কেন আপন করে নিচ্ছনা? কেন রাত্রিকে তুমি তোমার জীবন সঙ্গিনী ক'রে তোমার স্বপ্ন সফল করছোনা? আমিতো সরে এসেছি তোমার কাছ থেকে!

এই দিনের রেডিয়োতে গাওয়া গান নিয়ে দেশময় আর একবার হৈচৈ উঠলো। ভারতের সব ক'টি বেতার কেন্দ্র থেকে এল তার নিমন্ত্রণ, সিনেমা কোম্পানী থেকে সুর-শিল্পী হবার প্রার্থনা—এলো গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রেকর্ড করবার তাগিদ। কিন্তু নির্ব্বিকল্প পরাশর। এসব যেন তার গ্রাহ্যের মধ্যেই নেই।

দিন কয়েক পরে। রাত্রি পরাশরের ঘরে গান শিখতে এলো রাত ৮টা বেজে যাবার পর। এসে চুপ করে বসে রইল শোয়ানো তানপুরোটায় হাত রেখে। পরাশর একটা নতুন গানের স্বরলিপি করছিল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললো—কি রাত?
—কিছু'না! নিস্প্রাণ কণ্ঠে উত্তর এল। —তবে? মুখ গম্ভীর, চোখ ভিজে, চাউনি উদাস, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। মা বকেছেন?—না!—তবে?
—বলছিতো কিছু হয়নি! ঝাঁঝিয়ে উঠলো রাত্রি। এর পর পরাশর আর কোন কথা বললো না। এক মনে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলো। স্থির হয়ে বসে রইল রাত্রি ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়ে। যেন সে

গান শিখতে আসেনি, এসেছিল পরাশরকে একটা খবর দিতে। খবরটা দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে।

—হুঁ বলে পরাশর স্বরলিপি শেষ ক'রে রাত্রির দিকে চাইলো। তারপর বললো—মিয়া-কি-মল্লারটা গাও না শুনি।—না।—তাহলে শুয়ে পড়গে যাও। এই বলে তক্তাপোষে লম্বা হয়ে নিজেই শুয়ে পড়লো পরাশর।

রাত্রি কত হয়েছে কে জানে। চট্ করে পরাশরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলো বিছানায়। খাবার বোধ হয় এখনো ঢাকা পড়ে আছে। ধীরে ধীরে উঠে সে এগিয়ে চললো রান্না ঘরের দিকে। সমস্ত বাড়ী নিঃঝুম। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। কারা যেন কথা কইছে চুপি চুপি। সন্ধ্যার দিকে যে মেঘ ক'রে এসেছিল, মনে হয়েছিল আজ ভয়ানক বৃষ্টি হবে, রাত্রে সে মেঘ কেটে গিয়ে তারা ভরা আকাশের হাসি মুখ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে একটা মিষ্টি হাওয়া উঠেছে, বারান্দায় পামের চারাগুলি মাথা নেড়ে নেড়ে নৈঃশব্দের গান ধরেছে।

কথা হচ্ছিল রাত্রির বাবাতে আর মাতে। তার নাম উচ্চারিত শুনে পরাশর দাঁড়িয়ে পড়লো। শোনা গেল দুজনের মধ্যে একটা গভীর আলোচনা হচ্ছে, যার কেন্দ্র পরাশর।

—বলছো যে বিয়ে দিতে, ওর জাত জানো তুমি?—হিন্দু তো!

—শুধু হিন্দু বল্লে কি চলে? আমি যেখানে স্বপ্ন দেখছি একটা আই সি এস জামায়ের, সেখানে একটা চল্লিশ টাকা মাইনে গানের মাষ্টারের সঙ্গে রাতের বিয়ে দিতে বলো তুমি?

—কিন্তু মেয়ের মন জানো?

—জেনেই বা করছি কি? তার পর, যদি বুঝতাম যে তোমার মেয়ের জন্য ও কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা হলেও বা কথা ছিল, কিন্তু—

—ত্যাগ স্বীকার মানে? —ত্যাগ স্বীকার মানে যে নাম যে সম্মান পরাশর একা ভোগ করছে, তার ভাগ রাত্রিকে দিক! ভাল গান শিখছে রাত্রি এটা মানি, কিন্তু শুধু আমাদের জানায় কি আসে যায়? বাংলার লোক, ভারতের লোক সেটা জানুক, তবেতো বুঝবো?

—রেডিয়োতে—

—রেডিওতে নয়। সমস্ত দেশে। শোন, একটা কথা বলি! ও যদি রাত্রিকে নিয়ে ভারতবর্ষের সহরে সহরেএকটা ক'রে জলস্যার আয়োজন ক'রে ওকে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিতে পারে, তবেই আমি ওর সাথে রাতের বিয়ের কথা ভাববো, নইলে নয়। এটা গিভ্ এ্যাণ্ড টেকের যুগ।

—বারে বা। ও গরীব মানুষ। জলসার এত টাকা ও পাবে কোথায়?

—বেশ। আমি দেব এর জন্য হাজার বিশেক টাকা। তাতে যদি আমার মেয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়িকা বলে মালা পায়, যাগ গে টাকা। প্রস্তাবটা একবার করেই দেখ না?

—আমি পারবোনা—তুমি বরং রাতকে বলো!

মন্থর পায়ে পরাশর ফিরে গেল তার শোবার ঘরের দিকে। আকাশে আবার মেঘ করেছে। তারাগুলো কোথায় গেল? খ্যাতি দানের কণ্ট্রাক্ট করতে হবে! আমি কি চেয়েছি রাত্রিকে? পরাশর নিজের বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো। আজ মনে পড়ে আর একটি রাত্রির কথা। যেদিন সে রাত্রিকে কথা দিয়েছিল যে, তাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে যশ ও খ্যাতির বিজয় মাল্য এনে দেবে? আজ ঠিক সেই কথাই কি উচ্চারিত হচ্ছেনা রাত্রির পিতার মুখ থেকে? একেবারে

বিপরীত আঙ্গিকে ?

প্রেম ? আজ এই গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতায়, একক ঘরে সে প্রশ্ন করলো নিজেকে। পরাশর ঢুলী ! তুমি কি রাত্রিকে ভালবাসো ? চাও তাকে—নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে ? রাত্রির সুর্মা টানা দুটি চোখের বিলোল চাহনি ভেসে ওঠে মনের মধ্যে। এই নারীকে নিজের স্ত্রী রূপে পাওয়া যে কোন পুরুষের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিসের মান ? এবং কিসেরই বা সম্মান ? সেই জীবনেরই বা মূল্য কি—যদি ওই মূল্যবান দুটি চোখ ভেসে যায় ব্যর্থতার গোপন অশ্রুধারায়। কিন্তু কি দিতে হবে পরাশরকে বিনিময়ে ? সে তার মাকে সুখী করবে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কোথায় গেল সে প্রতিজ্ঞা ? বাড়ীতে তার মুখাপেক্ষিনী বিধবা মা। কার নাতি সে ? জগদ্বিখ্যাত কুঞ্জ ঢুলী। যার ঢাকের উপর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় মাটির প্রতিমায় হতো প্রাণ প্রতিষ্ঠা। স্থির হ'য়ে বসলে এখনো সে ডাক পরাশর শুনতে পায়। দুপুরে খাওয়ার জন্য দাদু তাকে ডাকছে—আরে পর্যাশ্‌র্যারে এ-এ-এঃ ! একদিন পথ থেকে ধরে এনে দুটি ক্ষুধার্তকে পেট ভরে খাইয়ে কুঞ্জ তাকে বলেছিল—দুনিয়াতে খালি দিয়্যা যাবা, বুঝ্‌য়্যাছো পরাশর ঢুলী, লিব্‌য়্যানা কিছু, খালি দিব্‌য়্যা, খালি দিব্‌য়্যা। আজ সে মহাপুরুষ পিতামহের কথা রাখবে। এবার নিঃশেষে দান করবে সে নিজেকে। বেরোবে তার শিষ্যাকে নিয়ে ভারত ভ্রমণে। চূড়ান্ত খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠা করবে সে তার মানসীকে। মানসী ? পরাশর নিজেকে প্রশ্ন করলো। সত্যিই কি রাত্রি তার মানসী ? তার প্রিয়া ? নিশ্চয়। সে যে আজ তার নিজের কানে শুনেছে তার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিতে—তার সঙ্গে…

সেই ব্যবস্থাই হলো। রাত্রির মা পরাশরকে আড়ালে ডেকে সব কথা খুলে বললেন। তুমি ওকে নিয়ে ঘুরে এলেই আমাদের যা মনের বাসনা, তা আমরা করবো। তোমাদের ফিরতে কতদিন হবে? তাতো কিছু বলা যায় না মা! তিন মাসও হতে পারে আবার পাঁচ মাস হতে পারে!

—তা যাই হোক! ত্রুটি রেখে কিছু করো না! তোমার যেভাবে ইচ্ছে—তুমি ওকে দিয়ে সেই ভাবে কাজ করিয়ে নিও, কেমন?

পরাশর কোন কথা না বলে হেঁট হ'য়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিলো। আর একটা কথা। রাতের কাছে টাকা রইল, তোমার দরকার হলেই চেয়ে নিও। কেমন?—আচ্ছা।

পাটনায় ওদের সঙ্গীত সম্মিলনীর বিবরণ যখন ফলাও ক'রে কাগজে বেরোলো তখন সবচাইতে অবাক হ'লো মিনতি! কেননা সে এর বিন্দু-বিসর্গ জানতো না! কাগজখানি পাশে রেখে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো।...

পাটনা থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ থেকে কাণপুর সর্বত্রই একটা মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। যেখানেই যাচ্ছে পরাশর ছাত্রীকে নিয়ে সেখানেই পাচ্ছে রাজকীয় সম্বর্ধনা! দলে দলে নর-নারী আসছে অভিনন্দন জানাতে ওদের বাংলোয়! ধীরে ধীরে রাত্রির মনে একটা সাময়িক মত্ততার ঢেউ এসে লাগছে! কাণপুরে সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পরাশর রাত্রিকে বললো—

—আমি চাই না কোনখানে ফাইনাল প্রোগ্রামের আগে তুমি আলাদা লোকের সংগে বাংলোতে আলাপ পরিচয় করো! অনেক ক্ষতি হয় ওতে।—কী ক্ষতি হয়?—অনেক ক্ষতি হয়! আর্টিষ্ট চীপ্‌ হয়ে যায়।

—ও, তাই বুঝি ? ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকালে ভক্তবৃন্দের সংগে আলাপ পরিচয়টা বন্ধ হয়ে গেল। নিজেকে বেকার মনে হতে লাগলো রাত্রির। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ! মেয়ে বিদায়ের পরদিন বাড়ীতে যেরকম লাগে তেমনি।

প্রতিদিন ভোরবেলাটা ভরে থাকতো মানুষের কল-গুঞ্জনে ; যেন ভক্তের কণ্ঠ-বীণায় আত্ম-প্রশংসার ভৈরবী আলাপ। মাঝে মাঝে চা...সিঙ্গাড়া। মাষ্টারজী হিংসে করে বন্ধ করলে এটা। নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল শুধু একটি যুবকের ক্ষেত্রে, নাম তার পুলক সেন। বিহারের বিখ্যাত বারিষ্টার এ-আর সেনের পুত্র ! প্রথম দিন সে পাটনায় রাত্রির সংগে দেখা করতে এল। অত্যন্ত দামী একটা ফুলের মালা হাতে আর কাঁধে একটি লাইকা ক্যামেরা নিয়ে। প্রচুর হাস্যালাপের পর প্রচুর ছবি তুলে নিজের ছোট্ট টু-সিটার খানায় উঠে বসে বাঁ হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে আর ডান হাতে ওয়েভ করতে করতে হুস্ করে বেরিয়ে গেলো। রাত্রি পুলক সেনের সংগে প্রথম পরিচয়েই তাকে প্রধান্য দিয়ে বসলো ! কেননা পুলক হচ্ছে সভ্যতার ক্ষেত্রে রাত্রির স্বজাতি ! স্বগোত্র ! খদ্দরের ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবী পরা মাষ্টারজীর মত সব কথায় হুঁ-হাঁ দিয়ে সারে না ! হিউমার করলে মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে না। মাষ্টারজী যেন একটা কিম্ভূত কিমাকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব। কোন সভ্য শিক্ষিত আসরে ওকে নিয়ে যাওয়াই ভুল্ !

যাই হোক তবু ওর নামেই নাম যখন, ওর গুণপনার ছায়াতলেই এখন পর্য্যন্ত রাত্রির আশ্রয়,—তখন ! যে ভাল্লুক সার্কাসওয়ালাকে পয়সা আর প্রচার দেয়, তার অত্যাচার সহ্য না করলে যে ব্যবসার ক্ষতি !

কিন্তু পরাশরের আজকের শাসন একেবারে অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। ভক্তের দল যদি আসে বাড়াতে অভিনন্দন জানাতে—তাদের পথ থেকে বিদায় করা কি ভদ্রতা! এ কোন দেশের রীতি?
আর্টিষ্ট চিপ্ হয়ে যায় ইণ্টারভিউ দিলে? না, এটা আমাকে একবার মনে করিয়ে দেওয়া যে, ভুলে যেওনা আমি তোমার অভিভাবক! আমার অনুগ্রহ-দত্ত প্রচারে তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে! অতএব আমার কথার অবাধ্য হলে তোমায় শাস্তি পেতে হবে। সে শাস্তির অর্থ আত্ম অবলুপ্তি! অসহ্য-অসহ্য! কিন্তু কি-ই বা করতে পারে রাত্রি এর উপযুক্ত জবাব দিতে হলে?
পরের দিন পরাশর গেছে যখন স্থানীয় ইনষ্টিট্যুট হলে আগামী কালের আসর সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে, এবং রাত্রি যখন রেডিয়ো খুলে বাংলা দেশের সংগে যোগাযোগ অনুভব করছে—তখন এল পুলক! হাতে মোটা এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার দণ্ড, কাঁধে যথারীতি লাইকা! রাত্রি ফুল হাতে পেয়ে নাকের কাছে ধরে—'হাউ লাভ্লি' বলে লাফিয়ে উঠে—রেডিয়ো বন্ধ করে দিলো, এবং পুলককে বসতে বললো। প্রথম দর্শনেই পুলক কেন জানা নেই—পরাশরকে যেন ভয় করতে সুরু করেছিল। ওই দীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত দর্শন, পরাশরের ভাব-লেশহীন মুখটা চোখে পড়লেই পুলকের বুকের ভেতরটা কেমন গুর্ গুর্ করে উঠতো। তার মনে হতো এই মানুষটা যেন আগাগোড়া কংক্রীটের তৈরী! মানে যেমন গলে না—অপমানেও তেমনি টলে না! তাই বসেই জিজ্ঞাসা করলো—মাষ্টারজী কোথায়?
মাষ্টারজী গেছেন কালকের য়্যারেঞ্জমেণ্টস্ কমপ্লিট্ করতে! কেন?—না, এমনি।—কেষ্ট! ডাকলো রাত্রি। বাড়ীর পুরোণো চাকর কেষ্ট। সঙ্গে

সঙ্গেই ঘুরছে! এসে দাঁড়াতেই রাত্রি বললো, একটু চা আর দুটো পোচ্ করে দাও চট্‌পট্! কেষ্ট চলে যেতেই রাত্রি যেন একটু অভিমান মেশানো গলায় বললো—আজ সকালে কিন্তু আপনাকে ভয়ানক এক্সপেক্ট করেছিলাম।

—সে কি! আমার আসার কথা ছিল নাকি?

—না! আসার কথা না থাকলেও আসতে পারেন, এই আশা ক'রে ঠকলাম্।

—সকালে তো আপনার দর্শন—

—সেটা সকলের জন্য নয়। এটুকু কি আপনাকে বলে দিতে হবে?

—আচ্ছা আর ভুল করবো না। অভয় পেলাম, এবার যখন তখন এসে বিরক্ত করবো। আমি বেকার মানুষ! বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে এসে—(আমার ভাষাকে মার্জনা করবেন) বাংলার সব মেয়েকেই কেমন জোলো জোলো লাগছে! মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে ছোট্ট একটু হেসে উঠলো রাত্রি। তারপর কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বললো —আমিও কি ওই জলীয় স্বাদের দলে?

—নিশ্চয়ই না! হাসির রেখা মুখে টেনে বললো পুলক। এখানে নুন ঝালের সমতা আছে বলেই তো পাত পাত্‌বো ভাবছি! যাগ্‌গে, দেখুন মিস্ রায়, কাল থেকে একটা কথা আমি ক্রমাগত ভাবছি। আপনার পাব্‌লিসিটির কি হচ্ছে? এত বড় সাফল্যের এই কি প্রচার? কাগজ ওয়ালাদের ডাকতে হবে, চা দিতে হবে, সাহায্য নিতে তাদের কাছে যেতে হবে। তবেই তো তারা আপনার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে! নইলে এ কী হচ্ছে মাথামুণ্ডু? মাষ্টারজী, উইথ ডিউ রেস্‌পেক্ট—উনি কিছুই জানেন না। নট ইভন্ এ-বি-সি-ডি অব মডার্ণ পাব্‌লিসিটি।

আপনি করুন না! করতে পারি—যদি অধিকার দেন!—অধিকার তো আপনাকে দেওয়াই আছে মিঃ সেন!

—কী করতে হবে না হবে, আপনি সেটা নিয়ে কালকে সকালে একবার আসুন না দয়া ক'রে, মাষ্টারজীর সংগে কথা কইয়ে দেবো। মানে, উনি না বললে তো—

—আ—চ্ছা! খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন রাজী হ'লো পুলক সেন। কিন্তু পুলক সেন রাজী হ'লে কী হবে? গোলমাল লাগলো পরাশরকে বোঝানো নিয়ে। সব কথা শুনে পরাশর ক্রমাগত এই কথা বলতে লাগলো,—কাগজের সম্পাদকেরা যদি গান শুনে মুগ্ধ না হ'য়ে, শুধু মুখের আলাপে কিছু লেখেন, তাহ'লে সেটা কখনো ভাল লেখা হ'তে পারেনা। বিশেষ ক'রে তাঁরা গান শুনবেন না, অথচ গানের সুখ্যাতি করবেন কী ক'রে? সেটা কি মিথ্যা কথা লেখা হবে না?

—এইটেই নিয়ম। করুণার হাসি হেসে বললো পুলক।

—অন্যায়টা কী ক'রে নিয়ম হ'তে পারে, আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে! পরাশর তবু তর্ক করে। এবার রাত্রি কথা কইলো।—কিন্তু মাষ্টারজী, মিঃ সেন বিলেত ফেরৎ এ বিষয়ে উনি অনেক কিছু জানেন, অনেক কিছু বোঝেন, ওঁর কথা আমাদের শুনতেই হবে।

—শুনতেই হবে কেন? বললো পরাশর।—উনি তাঁদের আজকের গানের আসরে নিমন্ত্রণ করুন না! তাহ'লেই তো—

—আপনি একেবারে অন্ধ আংগল্ থেকে কথা বলছেন মিঃ দাস! হতাশ ভাবে বললো পুলক।—শুধু তো এখানকার জন্যই নয়, এখান থেকে আমাদের দিল্লী, লাহোর, আজমীর, বম্বে, পুণা হায়দ্রাবাদ প্রভৃতির ফিল্ডও তৈরী ক'রে রাখতে হবে তো!

—তাতো হবেই! বললো রাত্রি।—না—না, আপনি এতে আপত্তি করবেন না মাষ্টারজী! আজই আপনি এই জন্তে মিঃ সেনকে হাজার দু'য়েক টাকা দিয়ে দিন। ওঁর সংগে বেরিয়ে আমি সম্পাদকদের সংগে কাল্‌কে আলাপ ক'রে আসবো।

—কিন্তু যে জিনিষ আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, তাতে টাকা খরচ করবার অনুমতি আমি দিই কী ক'রে?—তা'ছাড়া—টাকা তো আমাদের বেশী নেই। যা আছে—তাই দিয়ে গোটা ভারতবর্ষে গান গাইতে হবে তোমাকে!

—কী মুস্কিল! বাবাকে লিখলেই তো উনি তক্ষুণি পাঠিয়ে দেবেন টাকা!

—কিন্তু আমি তো চাইবো না। মানে—আমার আর চাইবার অধিকার নেই। পুলকের সামনে পরাশরের এই কথায় অপমান বোধ করলো রাত্রি। মুহূর্তকালের জন্ত তার মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠলো। একটু থেমে কাষ্ঠ-হাসি হেসে বললো—

—আপনার এ দয়ার তো কোন মানে হয়না। টাকাটা আমার বাবার, আপনার নয়। সংগে সংগে "তাতো বটেই" "তাতো বটেই" বলে পুলক হেসে উঠলো। পক্ষাঘাত রোগীর মতো পরাশর চেয়ে রইল রাত্রির সুন্দর মুখখানির দিকে। অমন চমৎকার দু'খানি ঠোঁট দিয়ে কী ক'রে বলতে পারে এমন কঠিন কথা? ঠোঁটে কি আঘাত লাগে না? আশ্চর্য্য! আস্তে আস্তে 'আচ্ছা' বলে পরাশর সেখান থেকে সরে গেল। সংগে সংগে রাত্রির কাছে এগিয়ে এল পুলক। চোখের পলকে তার হাতটি ধরে—উচ্ছ্বসিত গলায় বললো—ওয়েল্ ডান্ মিস্ রায়, ওয়েল্ ডান্, সত্যের প্রতি এই অনুরাগই আপনাকে দিগ্বিজয়ী করবে।

রাত্রি তবুও চুপচাপ ব'সে আছে দেখে—পুলক কণ্ঠে আরও আবেগ মিশিয়ে বললো—আপনি কিছু ভাববেন না মিস্ রয়! আমি কথা দিচ্ছি, আপনার সংগে সংগে আমিও ঘুরবো। আপনার মত শিল্পীর সংগ পাওয়া আমার সারাজীবনের পুণ্যফল। আর্টিষ্টকে কী ক'রে পুশ্ করতে হয় —সেটা আমি জানি। বিলেত যাওয়ার আগে আমি এ অঞ্চলের একজন ইম্প্রেসিভ্ ইম্প্রেসারিয়ো ছিলাম।

—থ্যাঙ্কস্! ক্ষীণ কণ্ঠে বললো রাত্রি। হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী যেন তার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে।

দিল্লী······

স্বাধীন ভারতের রাজধানী। ধনীর সুখস্বর্গ, বিলাসীর বসোরা। যুগে যুগে কালে-কালে এই দ্বিচারিণী মহা-নাগরী একপতিত্ব সহ্য করতে পারে নি বলে—ক্রমাগত সে প্রসাধন আর প্র-স্বাদন বদল করেছে। আজ তার বুকে বইছে খদ্দরের ঢেউ। মাথায় শোভিত খদ্দরের টুপী। প্রাসাদ-চূড়ায় উড়ছে খদ্দরের তৈরী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। আজ সে কংগ্রেস পোষিতা। যদিও অনেক আগে থেকেই ঘোষণা করা ছিল, তবু দিল্লীতে পা দিয়ে পরাশর যেন হকচকিয়ে গেল। তার কেবলি মনে হ'তে লাগলো, এখানে কী যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। তার সমগ্র জীবনের কোন একটা অধ্যায় যেন বদল হবে এই দেশে—

প্রথম দিনের গান আশাতীত ভাবে উৎরে গেল। শিক্ষিত জন-সাধারণ ছিল দর্শক। উচ্ছ্বসিত করতালি-ধ্বনি দ্বারা তারা অভিনন্দিত করলে শিল্পী পরাশর ও তাঁর ছাত্রীকে। দর্শকের ক্রমবর্ধমান তাগিদের চাপে পরাশরকে উঠে আসতে হ'লো মঞ্চে, সেখানে দাঁড়িয়ে সে জন-

গণেশকে প্রণাম করলো। সকলে চীৎকার করতে লাগলে---"আমরা আপনার গান শুনবো"।---সবিনয়ে কম্পিত গলায় নিবেদন করলো পরাশর যে, সে একটি ব্রত উদ্‌যাপন করতে বেরিয়েছে। যতদিন তার এই ব্রত উদ্‌যাপিত না হয়,—ততদিন পর্য্যন্ত সে নিজে গাইবেনা,—তাকে কেটে ফেললেও না। পরিবর্তে সে সবাইকে শোনাবে প্রিয়তমা ছাত্রীর গান। সেওতো তারই গান। গায়িকা রাত্রিইতো গায়ক পরাশরের সঙ্গীত সত্তা, নয় কি? তার সনির্বন্ধ অনুরোধে দর্শকমণ্ডলী চুপ ক'রে গেল।

পরাশর বাড়ী ফিরবার সময় হল্ থেকে নেমে পুলকের গাড়ী দেখতে পেলোনা। ভাবলো—কাছেই হয়ত কোথাও আছে,—এখুনি এসে তুলে নেবে তাকে। কিন্তু দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, বারটাও বাজে, অথচ ওদের দেখা নেই! পকেটে এমন একটি পয়সা নেই, যা দিয়ে সে বাড়ী ফিরে যেতে পারে। অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন পরাশর বাড়ী পৌছলো, তখন রাত্রি আড়াইটে বেজে গেছে। দেখলো অন্ধকার বারান্দায় দু'জনে দু'খানি চেয়ার পেতে বসে মৃদু গুঞ্জনে গল্প করছে। পরাশর কিছু বললোনা, কেন তাকে ফেলে চলে এল ওরা—কেনই বা এত রাত অবধি পুলক এখানে বসে,—ইত্যাদি কোন কথাই সে জিগ্যেস করলো না। তাকে দেখে ওরা কথা থামিয়ে দিল, এটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো,—কিন্তু না দাঁড়িয়ে সে নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

ভগীরথপুরে পরাশরের মা খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। যখন পরাশর কোলকাতায় ছিল,তখন মাসে অন্ততঃ একখানা চিঠি আসতো তার,—আর আসতো পাঁচটা, দশটা, কখনো কখনো বা পনেরোটা অবধি—টাকা।

আজ দেড় মাসের ওপর হ'য়ে গেল—তার কোন চিঠি পত্র নেই। দিনরাত 'কু' গাইছে মায়ের মন। একদিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে কাঁদতে কাঁদতে সকালে ঘুম থেকে উঠলো। কুঞ্জর ভাই নিকুঞ্জ, অনেক বয়স তার, প্রায়—পঁয়ষটি কি সোত্তর হবে। বৌদির কান্না দেখে থাকতে না পেরে বলে উঠলো—কান্‌ছো ক্যানে পরয়্যাশার মা? বিহান্ ব্যালায় কান্‌ছো ক্যানে তুমি?

মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টেনে দিয়ে পরাশরের মা উত্তর দিল—কাল রেতে শপন দেখ্য়্যা মনটা আমার বড্ডাই খারাপ হয়্যা গিয়্যাছে—পরাশয়্যার কাকা। কী হয়্যাছে আমার ছেল্য়্যার—বুঝতে পারছিন্য়্যা।

—ঠিকানা কী হোচ্ছে উয়ার?

আঁচলে বাঁধা সর্ব্ব শেষ পোষ্টকার্ডখানি নিকুঞ্জর হাতে দিল পরাশরের মা। হাজার হোক কুঞ্জর ভাইতো নিকুঞ্জ। ছেলেটার জন্য তার মনও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বড় ছেলে বংশীকে ডেকে বললো—তৈয়ারী হয়্যা লেতো বোংশ্য়্যা। আমি একবার কোলক্যাতা থেকে ঘুর্য়্যা আসি। লে বেটা জলদি লে! পাঁচটার গাড়ীতেই যেছি তেবে।···নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরাশরের মা চোখের জল মুছলো।

স্থির হ'য়ে সমস্ত কথা শুনলেন রাত্রির বাবা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলেন রাত্রির মা। সব কথা বিবৃত ক'রে নিকুঞ্জ বললো—এখন বোলেন খিনি বাবু মাহাশয়—ছেল্যা আমাদের কতি গ্যালো? ছোঁড়ার ন বছর বয়সে উয়ার বাবা শংকরা মর্য়্যা যায়—জানেন? সেই হ'তে দুখ্ ধান্দা কোর্য়্যা উয়ার মা উয়াকে মানুষ কোর্য়্যাছে। গাঁয়ে বোস্য়্যা আমরা শুনি পরাশয়্যা গান গাহিছে বেশ, উয়াতেই আমরা খুসী। বাবু মাহাশয়

আমাদের ঘরের ছেল্যা যে আপনাদের ছি চরণের তলায় আশ্‌শয় পেয়্যাছে—এই ঢের।

—কী জাতি আপনারা ? সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাত্রির বাবা।

—আজ্ঞা বাবু মাহাশয়, আমরা হোল্যাম গিয়্যা ঢুলী। পুজ্‌য়্যা-আচ্চাতে ঢাক বাজাই, পালে পাব্বনে ঢোল বাজাই, আবার চাষ-বাসও করি। উয়াতেই আমাদের সম্বচ্ছোরের খোরাক হয়। হেঁ-হেঁ, আমরা আবার মানুষ বাবু মাশায়, আমাদের আবার জাত আর জান্। আচ্ছা, তেবে আমরা উঠ্ল্যাম বাবুমাহাশায়—বাড়ী যেছি তেবে।

—ও। আচ্ছা। তাহ'লে খাওয়া দাওয়া—

—কিছু দরকার হোচ্ছেনা বাবু মাহাশয়। আপনি যে বস্য়্যা এত কথা বুললেন, ইয়াই আমাদের চোদ্দ-পুরুষের কপাল। পাতো-প্যোনাম বাবু মাহাশয়। উঠে পড়লো নিকুঞ্জ।...

ওরা চলে গেলে বাঁকা চোখে চাইলেন স্ত্রীর দিকে রাত্রির বাবা। ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো।—কিগো! মেয়ের বিয়ে দেবেনা পরাশরের সংগে? —ঝঁ্যাটা মার্। বালীগঞ্জী সভ্যতা ভুলে বলে উঠলেন রাত্রির মা।

দিল্লী। তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হ'তে এখনো ঘণ্টা চারেক দেরী। পরাশর নিজের ঘরে বসে একটা কাগজ নিয়ে অনেকদিন পরে তার মাকে চিঠি লিখছে। মনটা বড় চঞ্চল। আজকের অধিবেশনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আজ প্রেসিডেন্ট প্রসাদ, শ্রীনেহেরু আসবেন রাত্রির গান শুনতে। আজ যদি সে গান গেয়ে খুসী করতে পারে-এই

সব বিশিষ্ট অতিথিদের, তবে হয়তো আরম্ভের বাকী প্রোগ্রামগুলি নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হবে···

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো রাত্রি। পূর্ণাংগ প্রসাধন তখনো শেষ হয়নি তার। চুলগুলি এলোমেলো। হাতে একখানি চিঠি। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে উত্তেজনার আবেগে সে।"

—মাষ্টারজী! আপনি ঢুলী? ঢোল আর ঢাক বাজানো আপনার জাত-ব্যবসা? আপনার বাপ ঠাকুরদা দেশে এখনো ঢোল বাজিয়ে সংসার চালায়। এ্যাঁ? বলুন?

স্থির চোখে চেয়ে আছে পরাশর রাত্রির দিকে। যেন রাত্রির মুখে তার মৃত্যু দণ্ড উচ্চারিত হচ্ছে। আবার রাগে ফেটে পড়লো রাত্রি।---ছি, ছি, ছি, ছি! ঢুলী? কেন বলেননি একথা?—বলুন, কেন বলেননি? ঢু—লী? বেইমান! বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ? ছোটলোক কোথাকার! যে বেগে এসেছিল, ঠিক সেই বেগেই বেরিয়ে গেল রাত্রি। ···মাকে লেখা আধখানা চিঠি ধরাই রইল পরাশরের হাতে, স্থির হ'য়ে সেইদিকে চেয়ে ব'সে রইলো সে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল—টপ্ টপ ক'রে চোখের জল প'ড়ে লেখার অক্ষর গুলি ভিজে যাচ্ছে···ধুয়ে যাচ্ছে··· মুছে যাচ্ছে···

কখন যে দিন শেষ হ'য়ে—রাত্রি নেমেছে পৃথিবীর বুকে,কখন যে নাগরিকা সাজে সেজে উঠেছে দিল্লী নগরী···এসব কিছুই জানেনা পরাশর। যখন চমক ভাঙলো, চেয়ে দেখলো নিঃঝুম বাড়ীতে সে একা।···আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো পরাশর। দিল্লী রেডিয়ো রীলে করছে-

রাত্রির গান। বসন্ত-বাহার গাইছে রাত্রি। পথের জায়গায় জায়গায় বহুলোক জড়ো হ'য়ে চুপ ক'রে স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছে সেই গান।

জটলার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো পরাশর। এত আলো কেন আজ? গোটা দিল্লীতে কি একটু অন্ধকার জায়গা নেই, যেখানে বসে ও একটু একলা সময় কাটাতে পারে? এটা কী? পার্ক? ওইদিকের কোণটা একটু অন্ধকার অন্ধকার লাগছে, ওইখানে গিয়ে বসা যাক···

সির্, সির্, সির্, সির্ ক'রে নদীতে জোয়ার আসার মত ভাবনার একটা তরঙ্গ নামে মস্তিকের শূন্যপথ বেয়ে।···কী যেন করবার ছিল আজকে সন্ধ্যায়?···কোথায় যেন যাবার কথা ছিল.···কী একটা কর্তব্যে যেন ত্রুটি র'য়ে যাচ্ছে···ও, হ্যাঁ। রাত্রির গান। কে রাত্রি? কেন? রাত্রি তার ছাত্রী! সে কে? সে পরাশর, সে ঢুলী। পার্কের দক্ষিণ দিকের বড় বাড়ীটা থেকে অবিশ্রান্ত তান ভেসে আসছে রাত্রির গানের। খাসা তান করছে···চমৎকার তান···সাবাস্।···রাত্রি···সাবাস্। স্তব্ধ হ'য়ে আজ সমস্ত ভারতবর্ষ শুনছে তারই শেখানো গান···তারই তৈরী গলা···সাবাস্। পরাশর চিরকাল বেঁচে রইল মোহময়ী রাত্রির প্রতি গানে ···প্রতি তানে···প্রতি লয়ে···প্রতি কর্তবে···'জয়যুক্তা হও'। পৃথিবীর এই একটুখানি অন্ধকার কোণ থেকে, তোমার গুরু পরাশর,.. ঢুলী পরাশর··· তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছে···তুমি জয়যুক্তা হও।···তুমি···

ঢুলী···ঢুলী···ঢুলী···ঢুলী···সমস্ত পৃথিবী যেন পরাশরের কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে ভাঙা গলায় বলছে···ঢুলী, তুমি ঢুলি··· একি! রাত্রির গানের মধ্যে ঢুলী কথাটা শোনা যাচ্ছে যে!···অপূর্ব একটা গন্ধ নাকে লাগছে···ধূনোর গন্ধ? না। শিউলির গন্ধ? না। স্থলপদ্মের?···দেশকালের ব্যবধান বিদীর্ণ ক'রে কুঞ্জ ঢুলীর গলা শোনা

যাচ্ছে···ছেল্‌য়্যা পিল্‌য়্যারা সব তৈরী হয়্যা লেরে···ঢাকের চামড়াটা দেখ্‌য়্যা লে···কাঠিগুল্‌য়্যা চেঁছ্‌য়্যা লে···কাঁসি টাঁসি মেজ্‌য়্যালে···

একি। কোথায় শুয়ে আছে সে? ঘাসের উপর? জামা কাপড় সব শিশিরে ভিজে গেছে যে!···পার্ক? তাহলে বেঞ্চি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল সে···রাত কতো এখন? এক ফালি চাঁদের কুয়াসা-মোড়া আলো সদ্য বিধবার চোখের জলের মত ফ্যাকাসে, না? ঘোলা ঘোলা··· ধোঁয়া ধোঁয়া···কান্না-পাওয়া, কান্না পাওয়া আলো···

ভোরের আকাশে আলো জাগবার আগে পরাশর এসে দাঁড়ালো বাড়ীর সামনে, শ্রান্ত, ক্লান্ত···হতমান। গোটা বাড়ীটার দরজা জানলা সব বন্ধ··· এগিয়ে গিয়ে দেখলো—সদর দরজায় একটা প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। ও! ওরা তাহলে রাত্রেই চলে গেছে? ভাবলো পরাশর। যাক—বাঁচা···গেল। নিশ্চিন্ত। ভাগ্যিস্‌, দেখা হয়নি রাত্রির সংগে···

ভোরের হাওয়ায় মায়ের হাতের স্পর্শ···চোখে কেন জল আসে খালি খালি?

জলের স্রোতের মতো পাব্‌লিসিটি বেরোচ্ছে কাগজে—কিন্তু আশ্চর্য্য! তার মধ্যে পরাশরের নাম গন্ধ নেই! পরাশর নিয়ে গেল রাত্রিকে—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়িকা বলে প্রতিষ্ঠা করতে—কিন্তু আজকালকার পাব্‌লিসিটি পরাশর সম্বন্ধে নিষ্ঠুর নীরব। চিন্তিত হ'য়ে উঠলো মিনতি। দু' চারদিন বাদে তার এমন অবস্থা হ'ল যে—সে ভাল ক'রে খেতে পারলো না, ঘুমতে পারলো না—খালি ওই এক চিন্তা ঝড়ের বেগে তার মাথার মধ্যে ঘুর্‌পাক খেতে লাগলো—কী হ'ল পরাশরদা'র? তবে

কি—! কুচিন্তা ভীড় ক'রে আসে মনে। শেষকালে বাধ্য হ'য়ে এক-দিন সে ছুটে গেল বালীগঞ্জে রাত্রির বাড়ীতে। সেখানে যা খবর পাওয়া গেল,—তাতে জানা গেল—দিল্লী থেকে পরাশরের সংগে রাত্রির ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছে। যেদিন দিল্লীতে রাত্রি শেষ অধিবেশন করে, সেই-দিন বিকেল থেকে পরাশর কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। এই পর্যন্ত বলে রাত্রির বাবা আর মা যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিলেন পরাশরকে। যদি পুলক সঙ্গে না থাকতো—তাহ'লে কী হ'তো তাঁদের মেয়ের? জানোয়ার কি আর গাছে ফলে? জানোয়ার মানুষেরই ঘরে জন্মায়। ছিঃ!··· আবার এই পর্যন্ত বলে রাত্রির মা···তাঁর মেয়ের কতকগুলি ইদানীং কালের ছবি দেখালেন মিনতিকে। একটি সুদর্শন যুবক গাড়ীর ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে,—রাত্রি গাড়ীতে উঠবার মুখে বিপুল জনতাকে নমস্কার করছে। একটা নির্জন লেকের ধারে রাত্রি আর সেই ছেলেটি।···অর্গ্যানে বসে রাত্রি.. ঝুঁকে প'ড়ে তার মুখের দিকে চেয়ে সেই ছেলেটি···হাতে হাত বাঁধা রাত্রি আর সেই ছেলেটি প্রকাণ্ড একটি বাড়ীতে ঢুকছে···দু'ধারে কৌতুহলী জনতা···চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে মিনতির। এর মধ্যে কোথায় তার পরাশর দা? এই খ্যাতি-যজ্ঞের যে যজ্ঞেশ্বর—সে কই? সে কই? সে কোথায়? ভাবতে ভাবতে হোষ্টেলে ফিরে এল মিনতি। ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল—কী রকম? তাকে নিশ্চয়ই ফেলে চলে গেছ তোমরা! সেই সরল শিল্পপ্রাণ মধু-কণ্ঠ পরাশর? কিন্তু অত বড় বিরাট বিশাল দিল্লীতে একা একা কী করছে সে?...মিনতির মনে হ'ল,সে বোধ হয় পড়ে যাবে। কোন রকমে বিছানা আশ্রয় ক'রে চোখ বুঁজে সে দেখলো—একটা ময়লা কাপড়, ময়লা জামা পরে পরাশর একাএকা ঘুরে বেড়াচ্ছে দিল্লীর পথে পথে···লোকজন ঠাট্টা করছে···ছেলেপিলেরা ঢিল মারছে···

আর দু'মাস পরে পুজো। ভোর বেলার উঠে মিনতি গেল হেড্ মিস্ট্রেস এর কাছে। গিয়ে বললো সে পুজোর ছুটিটা কাল থেকেই নিতে চায়। দিতেই হবে, না দিলে উপায় নেই।

—কিন্তু দিলে যে আমারও কোন উপায় নেই মিনতি।

—কিন্তু—! টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ে মিনতির চোখ থেকে। এক এক ক'রে সমস্ত কাহিনীটি বোলে, সে কান্নাভরা গলায় বললো—

—সে রাত্রির যেমন গুরু, আমারও তেমনি গুরু। সে ভীষণ লাজুক, ভীষণ ভীতু, ভীষণ মুখ-চোরা। আমার মনে হচ্ছে রেণু দি, নিশ্চয় পরাশর দা—না খেয়ে দিল্লীর পথে পথে ঘুরছে—আমি যাই রেণু দি, আমি যাই! হয়তো এখনও তাকে ধরতে পারলে খুব দেরী হ'য়ে যাবে না। হয়তো—

—আচ্ছা যাও তুমি। শুধু দিন দশেক পরে একটা সিক্ রিপোর্ট ক'রে দিও,—কেমন?—আচ্ছা বলে কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থা মিনতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল...পরের দিন যাবার সময় হেড্ মিস্ট্রেস তাকে ডেকে তিনশো টাকা দু'মাসের মাইনে আগাম দিয়ে দিলেন।

দিল্লী ষ্টেশনে নেমে—এই সর্বপ্রথম মিনতি ভয়ে জড়ো সড়ো হ'য়ে গেল। যে উত্তেজনার ঝোঁকে সে এক দৌড়ে দিল্লী চলে এসেছে,—সেটা যেন কমে আসছে ক্রমে। যদি পরাশর দা দিল্লীতে না থাকে—যদি সে খেয়ালের মাথায় অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকে,—যদি! ...যদি...যদি ...যদি...

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়াল মিনতি। এদিক ওদিক চেয়ে একখানি টাঙা ভাড়া ক'রে এগিয়ে যেতে বললো। পথশ্রম-ক্লান্ত মিনতিকে বড় অপূর্ব লাগছিল দেখতে। বেশ খানিকটা দূর এসে

দূরে রাস্তার ডান পাশে একটা গাছতলায় অনেকগুলো লোক জড়ো হ'য়ে কী একটা মজা দেখছে। টাঙাটা পাশ দিয়ে যাবার সময় মিনতি চোখ ফিরিয়ে দেখেই চীৎকার ক'রে উঠলো—রোখো! রোখো! রোখো! টাঙা সম্পুর্ণ থামবার পূর্বেই উন্মাদিনীর মত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লো মিনতি। দুহাতে জনতা সরিয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকা লোকটির পায়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পরাশর দা! আমি এসেছি—আমি এসেছি! দেখ! চাও? পরাশর দা!

লোকটি চোখ চাইল। শিশুর মত নির্মল হাসিতে—উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল। কী যেন বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলো না। মিনতি তার হাত ধ'রে তাকে তুললো এবং বিস্মিত জনতার চোখের সামনে দিয়ে পথ ক'রে টাঙায় গিয়ে উঠলো। চালককে লক্ষ্য ক'রে বললো—একটা ভাল হোটেল। জল্‌দি! পরাশর এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিনতির মুখের দিকে। মিনতি বললো—রাত্রির খবর রাখো পরাশর দা? পরাশর ম্লান হেসে নিজের গলাটায় হাত দিয়ে দেখাল।

—একি!—তুমি কথা বলতে পারছো না? আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলো মিনতি।

ধীরে ধীরে ক্রন্দসী মিনতির মাথাটাকে ডান হাত দিয়ে টেনে এনে পরাশর নিজের কাঁধে রাখলো···

কিন্তু জীবন-যুদ্ধে হেরে যাবার মেয়েতো মিনতি নয়। সে অনমনীয়া, অদম্যা···অপরাজেয়া। হোটেলে এসেই তার প্রথম কাজ হলো রুদ্ধ-কণ্ঠ শিল্পীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ডাক্তার দেখলেন, বললেন—ভয় পাবার হয়তো কিছু নেই। অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও মানসিক আঘাতে ভোকাল্ কর্ডে

চোট্ লেগেছে। একটু যত্ন করলে হয়তো—। কিন্তু ডাক্তারের স্তোকবাক্য যে কত মিথ্যে, তা' প্রমাণ হ'তে সময় লাগলো মাত্র এক মাস।

এই এক মাসের ত্রিশটি রাত্রির ঘুম জানেনা মিনতি। অপলক চোখে ঘুমন্ত পরাশরের মুখের দিকে চেয়ে সে বসে থাকে বিছানার পাশে। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডাকে। বলে—আমার কোন পাপে তো এমন হ'ল না পরাশরদার? তা' যদি হয়, তবে—! এমন কতো হাজার হাজার 'তবে' এসে ভিড় করে তার মনে।...জাগরণে কাটে বিভাবরী।

কিন্তু সব চাইতে বিপদের কথা হচ্ছে,—তার কোলকাতা থেকে নিয়ে আসা টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে। যা আছে—তা' দিয়ে আর বড় জোর তিন দিন মাত্র চলতে পারে। তারপর? ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে মিনতির, এই সম্পূর্ণ বিদেশ, বিভুঁইয়ে কী করবে সে!

অবশেষে, সত্যই একদিন সমস্ত অর্থ ফুরিয়ে গেল। সকাল থেকে মিনতি ভাবতে ভাবতে ঠিক করলো...এমন সম্বল বা সম্পদ তো তার কাছে কিছু নেই, যার বিনিময়ে সে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।...হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মনে পড়লো...আছে, আছে, সম্পদ আছে। ওই পরাশরদারই দেওয়া অপূর্ব সম্পদ জমা আছে তার কাছে। সে হচ্ছে—সে হচ্ছে তার কণ্ঠ, সে হচ্ছে তার সংগীত। কিন্তু কে দেবে টাকা তার গান শুনে? রেডিয়ো? মন্দ কথা নয়, আজই খাওয়া-দাওয়ার পর সে যাবে দিল্লী বেতার-কেন্দ্রে।

বেতার স্টেশনে সে যখন গিয়ে পৌছলো, তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। গেট্ দিয়ে ঢুকে সে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো স্টেশন ডাইরেক্টারের। সুন্দরী তরুণী দেখে রিসেপ্শন্ অফিসারের মন ভিজলেও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সে প্রার্থনা—কোন মর্যাদা পেল না। কার্ড পেয়ে

স্টেশন ডিরেক্টর বলে দিলেন, তিনি এখন ভয়ানক ব্যস্ত, সাতদিন পরে এলে হয়তো দেখা হ'তে পারে, তাও দশ মিনিটের জন্ত। নিরুপায় মিনতি ফিরে চললো রেডিয়ো ষ্টেশনের গেট্ থেকে।

মন বলে, সাতদিন অপেক্ষা ক'রে এখানে অর্থ উপার্জন করার দুরাশার নাম—মৃত্যু। তার গুরু, তার প্রিয়তম, তার আত্মার আত্মীয় পরাশর দার কণ্ঠ আজ জন্মের মতো মৌনতার মহা তমসায় অবলুপ্ত। না—না—না! পথ চলতে চলতে চীৎকার ক'রে উঠলো মিনতি। পথচারী দু' একজন পথিক অবাক চোখে ফিরে চাইল ওর দিকে। লজ্জিত হ'য়ে আবার হাঁটতে লাগলো মিনতি।

আলোর মালা প'রে প্রিয়-সমাগম-প্রতীক্ষিতা দিল্লী নগরীর রাত্রি বাড়ছে। কিন্তু বাড়ী যাবার সময় পরাশরদার জন্ত দুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে যে! তবেই পরাশরদা আজ খেতে পাবে।…অপেক্ষাকৃত একটা ছোট গলির মধ্য দিয়ে সে পথ চলছে। একটা বাড়ীর সামনে ..দু'জন পুরুষ একটি তরুণীর সংগে তক্‌রার সুরু ক'রেছে…কোন টাকা পয়সার দেনাপাওনা নিয়ে। কড়া প্রসাধনে মেয়েটিকে শো-কেসে সাজানো পুতুলের মতো দেখাচ্ছে।…প্রকাশ্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রাত্রিবেলায় দুটি পুরুষের সঙ্গে এতো কিসের ঝগড়া ওর?…তবে কি—? ধড়াস্ ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে। নিজের অজান্তে মুহূর্তকালের জন্ত নিজের দেহের দিকে তার চোখ পড়লো, এবং সংগে সংগে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করলো সে।…সর্বনাশ! অর্থ উপার্জনের এ কোন গলিতে পথ ভুল ক'রেছিল মিনতি?

আর একটু বড় রাস্তা। পথে পথে ফুলের মালা বিক্রী হচ্ছে। ডানদিকের বাড়ীর দোতলা থেকে নারী কণ্ঠের ঠুংরী গান ভেসে আসছে। আড়ানা

গাইছে। এইরে! তান ভুল করছে যে···মিনতি দাঁড়িয়ে পড়লো! সাপের চোখের প্রেমে বিবশা হরিণীর মতো।···তবলিয়া কিন্তু প্রথম শ্রেণীর।···মাঝে মাঝে দু'একটি পুরুষ কণ্ঠের আনন্দ ধ্বনি ভেসে আসছে। কখন যে মিনতি সিঁড়ি ধরে উঠে গেছে দোতলায়, কখন যে প্রকাণ্ড হলঘরের মূল্যবান গালিচার এক প্রান্তে বসে পড়ে সে গান শুনতে সুরু করেছে—এসব তার মনেই নেই। চমক ভাঙলো পরমা সুন্দরী এক বাইজীর ডাকে। পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় সে মিনতিকে আহ্বান করছে এগিয়ে এসে গান গাইতে। মোহাচ্ছন্ন—মিনতি উঠে গিয়ে আসরে বসে—তানপুরাটা তুলে নিয়ে গুরুকে স্মরণ করলো। তারপর মধুর গলায়—ধীরে ধীরে আলাপ সুরু করলো খাম্বাবতীর। স্তব্ধ-বিস্মিত এবং স্তম্ভিতা বাইজী ও তার ভক্তবৃন্দের নিষ্পলক চোখের সামনে গান শেষ ক'রে—মিনতি যখন নমস্কার করলো সবাইকে, তার পরেও পুরো দু' মিনিট কেটে গেল—সকলের কথা কইতে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন···কৌতূহলের উপর কৌতূহল···কোত্থেকে আসা, কোথায় থাকা, কী করা হয়—দিল্লীতে ক'দিন অবস্থান, এ সমস্ত প্রশ্নের বিনীত জবাব দিয়ে মিনতি বললো—তার গুরুর খুব অসুখ। চিকিৎসায় অর্থের প্রয়োজন, তাই—। তার নতুন পাওয়া বাইজী বোন কি কোন ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে? টা—কা! হাঁ ক'রে রইলো আসর। টাকা কি রোজগার করবার জিনিষ? ওতো এমনি এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে! যাই হোক, বাইজী তাকে যাবার সময় পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বললো যে, কাল থেকে ব্যবস্থা ক'রে দেবে—আলাদা একখানি ঘরের। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা অব্ধি সেখানে গান গাইবে তুমি। যা পাবে, তাই দিয়ে নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে উঠবেন তোমার গুরুদেব।

পরাশর একথা জানতে পারলোনা যে, প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায়, ক
লক্ষপতি, কত কোটিপতির একমাত্র ছেলের অঞ্জলি-ধরা কুবেরের ঐশ্বর্যকে
মিনতি দুই পা দিয়ে ঠেলে ফেলে আসছে।…দিল্লী সহরে দিন দশ
পনেরোর মধ্যেই প্রচার হয়ে গেল এই বিদূষী গায়িকার খ্যাতি! লক্ষহীরা
তার নাম। এত লোক গান শুনতে আসতে লাগলো—যে প্রতিদিন সেই
জনতার সকলকে গান শোনানো একটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।…

পূর্ণ বেগে চলতে লাগলো চিকিৎসা! দিন চব্বিশ পরে ডাক্তার বললেন—
চিকিৎসা ক'রে পরাশরের গলা সারবে না। হঠাৎ কোন চমক, কি বেদনা,
কি আনন্দের অনুভূতি অথবা অপ্রত্যাশিত কোন তীব্র উত্তেজনায় সে তার
হৃতকণ্ঠ ফিরে পেলেও পেতে পারে। নইলে,—কিন্তু সে আশাও তো
দুরাশা। কবে ঘটবে সেই অঘটন? কোথায় অপেক্ষা করছে সেই দৈব-
নির্দ্দিষ্ট আরোগ্য লাভের চমক!

সিনেমার দেশ বম্বে! দিল্লীর চাইতে কোন অংশে কম নয়, কোন অংশে
নয় কম গৌরবময়ী। খ্যাতি লাভের প্রশস্ত জায়গা! আজ একটি হলের
সামনে প্রচণ্ড ভীড়। লোকে লোকারণ্য চারিদিক। আলোতে, হাসিতে
সমারোহে, পূর্ণ যৌবনের হাতছানি। আজ এখানে রাত্রি রায় গান
গাইবে। আজ এই আসরেই পাবে সে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়িকার
জয়মাল্য। সব চাইতে ব্যস্ত আজ পুলক সেন। এখান থেকে ওখানে
দৌড়াচ্ছে, একে নড্ করছে, ওকে ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শান্ দিচ্ছে। সংবাদদাতাদের
দিচ্ছে ইন্‌ফরমেশন! একটু পরেই প্রকাণ্ড একখানি নতুন মডেলের গাড়ী
থেকে নামলো রাত্রি। আলো-ঝলমল রাত্রির প্রতীক যেন। সাজে, লজ্জায়,
ভংগীতে আর ভাষণে অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী অনন্যা!

পাটনা থেকে যে দিগ্বিজয়ের সুরু, আজ তার উদ্‌যাপন! মঞ্চের

চারিধারে গোল হ'য়ে বসে সহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ···শ্রেষ্ঠতম কয়েকজন বিচারক শিল্পী। শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি গায়িকা! আজ তাঁরাও এসেছেন প্রতিযোগিতায় সুদূরিকা বাঙালিনীকে পরাজিত করতে। সংকল্প ফুটে উঠেছে সকলের মুখে। রাত্রি যখন মঞ্চে উঠে এসে এঁদের মাঝখানে আসন গ্রহণ করলো, তখন প্রচণ্ড করতালি ধ্বনি দ্বারা সমাগত জনতা তাকে সম্বর্ধনা জানালো, বিনীত নমস্কারে প্রত্যভিবাদন ক'রে রাত্রি বসে পড়লো। যথারীতি ঘোষণার পর প্রথমে একটি সুন্দরী মারাঠি মেয়ে গান ধরলো। হলের বাইরে লাউড্ স্পিকার দেওয়া সত্ত্বেও ভয়ংকর ভীড়। সকলেই চেষ্টা করছে টিকিট কেটে আগে ঢোকবার জন্য! সেই প্রবহমান জনতার মধ্যে দেখা গেল মিনতি ও পরাশরকে। তারা দিল্লী থেকে গতকাল এসে পৌছেচে! টিকিট কেনা ছিল, যদিও সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর। ধীরে ধীরে জনতার অনুগমন ক'রে তারা হলে গিয়ে নিজের আসনে বসলো, একেবারে পিছন দিকে। পরাশরকে যেন আর চেনাই যায় না, মুখ চোখ কালিময়! কণ্ঠের হাড় দেখা যাচ্ছে মিনতির, কিন্তু তবু যেন পরিতৃপ্তা সে। রোগা হ'য়ে গেছে। যেন দুস্তর পরীক্ষোত্তীর্ণা অগ্নিশুদ্ধা জনক তনয়া! বিবর্ণ গৌরাভা ফুটে উঠেছে তার শ্যামলিম মুখমণ্ডলে। সে যে গুরু সেবার অধিকার পেয়েছে! আসনে বসে পরাশর একদৃষ্টে চেয়ে আছে রাত্রির দিকে। যেন বাইরের জগতের সংগে তার কোন সংশ্রব নেই, জীবনে শুধু রাত্রির দিকে চেয়ে থাকাই তার একমাত্র কাজ। পর পর তিনটি বিভিন্ন প্রদেশের মেয়ে গান গা'হ্বার পর ঘোষিত হলো—এবার ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ রামলোচনের প্রিয় শিষ্যা রাত্রি রায় আপনাদের একখানি গৌড় সারং গেয়ে শোনাচ্ছেন। 'রামলোচনের ছাত্রী' ঘোষণা শুনে মিনতি চাইল গুরুর দিকে। কিন্তু পরাশর বাহ্যজ্ঞান শূন্য।—

গান সুরু হলো। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ। যেমন তার ঠাট্, তেমনি তার বিস্তারের কলা নিপুণতা। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে দর্শক মণ্ডলী। পর্দায় পর্দায় গ্রামে গ্রামে উঠ্ছে রাত্রির সুললিত কণ্ঠস্বর। সঙ্গে তবলা সংগত করছেন সেই মারাঠী গায়িকার তবলিয়া! গান যত দ্রুত লয়ে এসে পৌছলো— ততই অপূর্ব তান করতে করতে শমে ফিরে আসতে লাগলো রাত্রি। তার গুরুদত্ত ঘরানার নির্ঝর-গতি-তান বৈচিত্র্য নির্বাক বিস্ময়ে সকলে শুনছে! প্রত্যেকের মুখে ফুটে উঠেছে সপ্রশংস বিস্ময় রেখা! পিন্ পড়লে আওয়াজ পাওয়া যায়—এমন স্তব্ধতা বিরাজ করছে হলের মধ্যে। উচ্চ পর্দায় তান করতে করতে হঠাৎ এক সময় রাত্রির মনে হ'ল, সে বোধ হয় মাত্রা ভুল করেছে। বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয় সে নীচে নামলে শমে পৌছতে পারবে না। এই ভাবতে ভাবতে সে এক সময় নীচের দিকে তান ক'রে নেমে এসে বুঝলো—সত্যিই তার মাত্রা ভুল হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তান করতে করতে উপরে উঠে গেল রাত্রি।

ভয়-ভয়-ভয়ংকর ভয়···সম্মান হানির ভয়···বেইজ্জতির ভয়···এতদিনের আশা-ভরসা-স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবার ভয়···তান করতে করতেই রাত্রি ভাবছে, পাবে না সে শ্রেষ্ঠ গায়িকার জয়মাল্য, হলো না ভারত বিজয়িনী হওয়া। তা না হোক, কিন্তু শমে পৌছতে না পারলে হলের মধ্যে হাজার হাজার দর্শকের কণ্ঠে যে প্রচণ্ড হাসির রোল উঠবে···তখন? একি! তানের স্বরগ্রাম মনে পড়ছে না কেন? তবলচীর মুখে ওকি বিদ্রূপের হাসি! তার আগের গায়িকা তিনটি তবলচীর দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে কেন? সমবেত শ্রোতার চোখে ও কিসের আশংকা? আর একবার শেষবার···প্রাণপণে নীচে নামবার চেষ্টা ক'রে আবার সে চড়া পর্দায় উঠে গেল। ধড়াস্ করে উঠলো বুকের মধ্যে। কী হবে? কি হবে? কি হবে?

এইবার, এতক্ষণ পরে তার সমস্ত আত্মা বিমথিত করে একটা অতি করুণ প্রার্থনা জেগে উঠলো। গুরুদেব! মাষ্টারজী···কোথায় তুমি? রক্ষা করো তোমার অবাধ্য শিষ্যাকে। আমার কণ্ঠে তোমার মান আজ থর থর ক'রে কাঁপছে। নিজের সম্মান তুমি নিজে এসে রক্ষা করো! মাষ্টারজী মাষ্টারজী! পাগলের মতো বড়ো হয়ে উঠেছে পরাশরের দুই চোখ! দৃষ্টির মধ্যে জেগে উঠেছে ভয়···হতাশা···বেদনা···ব্যাকুলতা, তার আত্মা থেকে জেগে উঠছে একটা মাত্র প্রার্থনা···গুরুদেব! রক্ষা করো···রাত্রিকে রক্ষা করো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে রাত্রির সমস্ত মুখে। তান করতে করতে সে বুঝতে পারলো, টপ্ টপ্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে তানপুরার ওপর। স্লিপ করছে হাত···চোখের কোলে কোলে ছল ছল ক'রে উঠছে অশ্রুর কুয়াসা···ঝাপ্সা···এত কমে গেল কেন হলের আলো? ফিউজ্ হবে নাকি? মাষ্টারজী···তুমি কোথায়? মাষ্টারজী! অপরাধ করেছি, শাস্তি দাও ··ক্ষমা করো···মাষ্টারজী!······হঠাৎ যেন দৈববাণীর মতো হলের প্রান্ত দেশ থেকে জেগে উঠলো একটা অপূর্ব জোরালো সুরেলা কণ্ঠ! যে পর্দায় গৌড় সারংয়ে তান করছে রাত্রি, অবিকল সেই পর্দার সেইখানে তান ভেসে এল। আত্মবিস্মৃত৷ ভয়ভীতা রাত্রি সেই তানের পথ ধরে নামতে লাগলো, ধীরে ধীরে···অপূর্ব বলশালীতার সংগে। দুটী কণ্ঠ একচুল এদিক ওদিক নেই। নামতে নামতে সেই তানপ্রবাহ প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো শমের উপর, কাঁটায় কাঁটায়, অক্ষরে অক্ষরে, ধ্বনিতে ধ্বনিতে, সুর-তান-লয় এক হ'য়ে লীন হ'য়ে গেল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে! যেন একের নির্ব্বিকল্প সমাধি—অপরের নির্ব্বিকার অসীমে।

গান শেষ হ'ল। করতালি ধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জানাতে জানাতে বিমুগ্ধ দর্শক পেছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করে—কে এই সংকট ত্রাতা?

কিন্তু কই না! কেউ তো নেই! সুবিশাল ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়িকা-স্বীকৃতা হলো গরবিনী রাত্রি রায়। প্রায় জনতার কাঁধে চড়ে সে বেরিয়ে গেল বাইরে···যেখানে সহস্র জনতা তার এক ঝলক দর্শনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে। হলের মধ্যে থেকেও তাদের সোল্লাস ধ্বনি, মেলার দূরশ্রুত জন-কল্লোলের মত শোনা যায়।

জনশূন্য হল থম-থম করছে নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায়! একটি একটি ক'রে আলো নিভে যাচ্ছে। দূরে, কোণে, সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর দুটো আসনে বসে আছে মিনতি আর পরাশর। পরাশরের মুখ মিনতির কোলে গোঁজা। রক্তে ভেসে গেছে পরাশরের মুখের কাছে মিনতির কাপড়টা, স্তব্ধ হ'য়ে সামনে চেয়ে আছে মিনতি। তার বুকের উপরকার কাপড়টাও ভেজা, তবে রক্তে নয়···চোখের জলে······

একমাস পরে। বম্বে থেকে বাইরে একটি পল্লী-গ্রামের বহিঃ সীমানায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একখানি খড়ো ঘর! পরাশর শুয়ে আছে, বিছানায় পায়ের কাছে বসে মিনতি। সেবাপরায়না তাপসী মহাশ্বেতা। পূব্ জানালা দিয়ে সুখ-সংবাদের মতো প্রভাত রৌদ্র এসে পড়েছে বিছানার তলায়···মেঝের উপর। পরাশর বোধ হয় তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল। এইবার চোখ খুলে ঠাণ্ডা গলায় ডাকলো—মিনু!—এই যে আমি! বলে মাথার দিকে সরে বসলো মিনতি।

—তুমি বোধহয় একটা খবর জানোনা?

—কী বলো তো?

—জাতে আমরা ঢুলি।

—জানি !

—জানো !

—যখন তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকতে। তখন তো ভগীরথপুরের চিঠি প্রায়ই আসতো। মায়ের লেখা। তোমায় বলিনি দুঃখ পাবে বলে। দুঃখ কষ্টের কথাই তো থাকতো কেবলি? একটু থেমে মিনতি আবার বললো, আমি অবশ্য যখন যে রকম পারতাম, মাকে পাঠিয়ে দিতাম। কোন মাসে পাঁচ, কোন মাসে দশ, কোন কোন মাসে পনেরো।

—পাঠিয়েছো ? তুমি টাকা পাঠিয়েছ মিনু ? আমার মাকে ?

—হ্যাঁ !

—মিনু ! কী যেন বলতে গিয়ে পরাশর কেঁদে ফেললো। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললো—তখন কেন আমি দেখতে পেলাম না ? কেন আমি বিদ্যুতের আলোয় ভুলে মাটীর প্রদীপকে ভেঙ্গে— ফেললাম মিনু ! আজ যে সব অন্ধকার।—

—কে বললে অন্ধকার ?—আলো নেই যে মিনু !

—তুমি সেরে ওঠ। আলো আছে !

—আছে আলো ?

—আছে বইকি !

—আছে আলো ! জ্বালাও আলো—জ্বালাও ! বিড়্ বিড়্ করে বললো পরাশর।

—তুমি কি একটু একলা থাকবে ? আমি তোমার দুধটা গরম করে আনি ?

—আনো ! এই বলে পরাশর চোখ বুঁজলো। দূরে কোথায় যেন ঢাক বাজছে। পরাশর ডাকলো—মিনু ! বেরিয়ে যেতে গিয়ে মিনতি ফিরে

এল। কী?—এটা কী মাস?—আশ্বিন।—আশ্বিন—তাই বলো? তাই আমার মনের মধ্যে খালি শিউলি ঝরছে আর ফুটছে? পূজো…কবে পূজো? মিনতি জবাব না দিয়ে চুপ করে আছে দেখে চোখ খুলে পরাশর বললো—কি গো জবাব দিচ্ছনা যে! পূজো কবে? বাংলা মায়ের পূজো? আজ—আজই সপ্তমী!—ও! আজই? ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিনতি রান্না-ঘরের দিকে।…মা ঠাগ্‌র্যাণ গো! আমরা এল্‌য়্যাম গো! কুঞ্জর গলা বেজে উঠলো…চকিত হ'য়ে চোখ চাইল পরাশর…না, কেউ তো নেই…সব ভুল…স্বপ্ন…মায়া। ধীরে ধীরে সমস্ত চেতনা ভরে বেজে উঠলো পূজোর ঢাক…সন্ধির বাজনা বাজাচ্ছে কুঞ্জ!

নেচে নেচে মায়ের মন্দিরের সামনে ঢাক বাজাচ্ছে কুঞ্জ…দু'চোখ বেয়ে ঝরছে জল।…আমরা জাত খারাপ নইগো…জাত খারাপ নই। আমরা তোমাদের উৎসবে, তোমাদের আনন্দে, একটু ঢাক আর ঢোল বাজিয়ে নিজেদের সংসারটা চালাই।…তোমাদের শোকে নয়…দুঃখে নয়… বেদনায় নয়…পূজোতে, বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, আনন্দিত মানুষের ঘরে আমরা আনন্দের বাজনা বাজাই…আমরা বাংলা দেশের ঢুলী। আমরা জাত খারাপ নই। পরাশ্‌য়্যা!—কী বলছো দাদু! কাঁসিটা লে শালা, কাঁসিটা লে. হাতে তুলে নিল কাঁসি আট বছরের বালক পরাশর। ষষ্ঠীর দিন হাসতে হাসতে আসা…আর দশমীর দিন কাঁদতে কাঁদতে যাওয়া… এই তো ঢুলীর জীবন। এরই মাঝে চাঁদ ওঠে, শিউলী ফোটে, দোলে কাশ, অকালে ফলে থরমুজ…ঘাস যায় শিশিরে ভিজে!

ঢোল বাজাও বাংলার ঢুলী, ঢাক বাজাও ঢাকী…

যুগ যুগান্তর…জন্ম জন্মান্তর ধরে ঢাক বাজাও। জগতের প্রবহমান কাল-প্রবাহের মধ্যে ঢেলে দাও তোমাদের মাধুরীর সুধাধারা! আরু

কেউ ভাল না বাসুক, মা দুগ্গা তো বাস্‌বে—মা দুগ্গা ভাল বাসবে তোমাদের···

পর‍্যাশ্‌য়্যারে—এ—এ—এ—এঃ !···ষেছি—ই—ই—ই—ই—ইঃ ! মনে মনে উত্তর দেয় পরাশর। দুধ নিয়ে মিনতি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলো, প্রত্যেককে সে চিঠি দিয়েছে এই ঠিকানা জানিয়ে, আশ্চর্য্য ! কেউ একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলোনা ? ঘরের মধ্যে গিয়ে পরাশরের দিকে চাইতেই তার হাত থেকে পড়ে গেল দুধের বাটী। পরাশরদা···পরাশরদা মারা গেছে ! স্বপ্ন একটি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে মৃতের মুখে···সে হাসি তৃপ্তির, আনন্দের···মুক্তির। মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মিনতি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল···যদি কাউকে পাওয়া যায়···যদি পাওয়া যায় দু-একটি শ্মশান বন্ধু, গুরুকে দাহ করতে হবে তো ! বাবার সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিলাম, সঙ্গে ছিলে তুমি। আজ আমার সঙ্গে কে যাবে পরাশরদা ? জল নেই কেন চোখে ? কেন এই শোক অনুভূত হচ্ছেনা তীব্র বেগে ? মিনতির বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল···আর ভয় নেই। আর কেউ তার পরাশরদাকে রূপের মোহে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ! এতদিনে মিনতি পেলো পরাশরকে। এতদিন পরে আজ তার প্রিয়কে পাওয়া, তার শ্রেয়কে পাওয়া সম্পূর্ণ হ'লো···সার্থক হলো···নির্ভয় হলো······। মিনতি বেরিয়ে গেল।

বাইরে থেকে উঠানে প্রবেশ করলো পিওন। সে কাউকে না ডেকে দাওয়ায় উঠে বাঁ-হাত দিয়ে দরজাটা একটু ঠেলে, ডান হাতে ধরা একটা লাল রংঙের কার্ডের ঠিকানা দেখে "পরাশর ঢুলী" বলে হেঁকে কার্ডখানা ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল···

চিঠি নিমন্ত্রণের। পড়েছে সেখানা মৃত পরাশরের বুকে। তাতে ছাপা পুলকের সংগে রাত্রির বিয়ের নিমন্ত্রণ···। কিন্তু আমরা দেখলাম পরাশরের মৃত দেহ আর বিয়ের চিঠি ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে ভট্টপাড়ার বাংলা মায়ের মন্দির, সেখানে তখন ধুপের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন মন্দিরে সন্ধি পূজো চলছে···হরিচরণ পূজো করছেন···আর প্রাঙ্গনে নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে কুঞ্জ ঢুলি,আর তার পরিবারবর্গ, আর নাচছে দাদুর সংগে সংগে কাঁসি বাজিয়ে একটি আট বছরের ফুটফুটে কিশোর···সে পরাশর·········

ভাগফল

শোভনা গিয়েছিল পুকুর ঘাটে জল আনতে। গ্রামের পুকুর ঘাটে যে মুখ রোচক পর-চর্চ্চার অবতারণা হয়ে থাকে—সেদিনও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। কথা হচ্ছিল হরিদাস নমোর বৌ মালতী নমোকে নিয়ে। হরিদাস গিয়েছিল গোপালগঞ্জ মামলা করতে। দুদিন পরে সে ফিরে আসে রাত্রে। ফিরে আসার দশ মিনিটের মধ্যে মালতীর আর্ত্ত চীৎকারে গ্রামের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। দু-একজন উৎসাহী যুবক, তিন চারিজন বৃদ্ধ হ্যারিকেন দুলিয়ে হরিদাসের বাড়ীতে পৌঁছে দেখতে পেলো—মালতী রক্তাক্ত দেহে মেঝের

উপর লুটোচ্ছে—এবং হরিদাস কোথাও নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেল মালতীর দেহে প্রাণ নেই······

বোস গিন্নী গাঁয়ের ডাক-সাইটে মেয়ে। স্বামীর দেহত্যাগ হয়েছিল কুৎসিত ব্যাধিতে।—গাঁয়ের কেউ রাজী হয়নি শবানুগমন করতে। ফলে রাইবাঘিনী বোস গিন্নী ক্ষেপে গিয়ে স্বামীর দেহ একাই কাঁধে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে দাহ করে এসেছিলেন। সেই তিনি, সেদিন পুকুর ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষ্‌ছিলেন। মালতীর কথা উঠতেই খ্যাঁক্‌ করে উঠলেন।

—হইছে-হইছে-থো! মালতীর সোয়ামীই তারে খুন কইর‍্যা গেছে। গোপালগঞ্জর থন্‌ আস্‌ছিল না?

—আসছিল না? আমাগো কর্ত্তার সাথে দেখা হইছে। হাতে এট্টা ইল্‌সা মাছ আছিল। আমাগো কর্ত্তার কাছে কইছে, আবার দশ দিন পর যাইতে হইবো। বললো ডাক্তার গিন্নী।

—কে কইছে?—হরিদাস? বিস্মিত কণ্ঠ চক্রবর্ত্তী গিন্নীর।

—হ! তবে শোনো কী?

—তবে মালতীরে ক্যান্ কাইট্টা থুইছে তার সোয়ামী?

—অখন, সে কথা কইলে হইবো কী? হে তো—পলাইছে।

শোভনার জল ভরা হ'য়ে গিয়েছিল,—সে দাড়িয়ে দাড়িয়ে এদের আলোচনা শুনছিল। এবার উত্তর দিল—

—পাচ মাসের কথা কইয়্যা লাভ কী? অখন্ যা ঘটবো—হেই কথা কন?

—অখন্ আবার কী ঘটবো? মোস্‌লাগো ত্যাজ বাড়ছে, আর কী?

কাউল্‌কা কোইল্‌কাত্তার থন্‌ ঠাকুর আসছেন। তিনি কইলেন—বাংলা দেশ নাকি ভাগ হইয়া যাইবো।

—ক্যাম্‌বায়? বোস গিন্নী সবিস্ময়ে বললেন।

—হ। মোস্‌লারা নিবো কোটাইল্‌পাড়—আর হিন্দুরা নিবো কইল্‌কাত্তা। এই তো কইতে ছিলেন।

—আ লো! তোর ঠাকুর কি পীর হইছে? কোইথনে শোন্‌ছে কী এট্টা কথা—ল!

দূরে বসে আর একটি বিংশ বর্ষীযা বধূ নীরবে কলসী মাজছিল, সে এতক্ষণ পরে মুখ তুলে বললো—

—হ—হ আমিও শুনছি তাই। কোইল্‌কাত্তায়—হিন্দু-মোস্‌লায় মারামারি কর্‌তে লাগ্‌ছে। তাই দেইখ্যা গবরমেণ্টো নাকি গড়ের মাঠে দুই দলেরেই ডাকছে! ডাইক্যা কইছে—রক্তারক্তি কইরোনা। তোমরা লও গিয়া গোপালগঞ্জ—আর ইসে—তোমরা লও কইলকাত্তা।

—এই ব্যবস্থা হোইছে? বোস গিন্নীর কণ্ঠে রাগ।

—হ। বললো নব যুবতী!

—কিন্তু গোপালগঞ্জ যদি মোস্‌লা লয়—তবে তোমাগোর অদৃষ্টে আছে কী? যাইবা কই? খাইবা কী!

—ক্যান্‌! হিন্দুস্থানে যামু।

—হ, তারা তো মালা লইয়া বস্যা রইছে। শিয়ালদহ ইষ্টেশনে লাম্‌বা, আর ফট্‌ফট্‌ কইর‍্যা মালা দিবোনে তোমাগো গলায়।…এত খানি বয়স হইছে—দেখ্‌ছিও ম্যালা—কথাও শুনছি ম্যালা। কিন্তু বাপ-ঠাকুরে যে কথা কয় নাই, হেই কথা আজ কইথে লাগছো তোমরা। তোমাগোর মুখেও ছাই, আর যারা এই হগল কথা কয়—তাগোর মুখেও ছাই…

গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বোস গিন্নী ঘাট থেকে চলে গেলেন। কিন্তু যে বিপদের আভাস সেদিন পুকুর ঘাটে শোনা গিয়েছিল—ক্রমশঃ তা' মানুষের মুখে মুখে পরিস্ফুট হ'তে লাগলো। দেখতে দেখতে কোটালীপাড়ার অধিবাসীদের মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘনাল। চাপা ফিস্‌ ফিস্‌ আওয়াজে পরিকল্পনা চলতে লাগলো অনিশ্চিত ভাবী জীবন যাত্রার······

দিন পনেরো যেতে না যেতেই একদিন সকালে গ্রামে উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল। গোকুলের বৌকে রহিম সেখের ব্যাটা পুকুর ঘাটে হাত ধরে টেনেছে। গোকুলের বৌ তাকে গালাগালি করাতে সে নাকি হেসে বলেছে—

—মিষ্ট মুখের তিতা কথাও ভাল লাগতেছে রে ভাই! কিন্তু যাইবা কই? আইজ্‌ না হয় কাল। লজ্জা রাঙা গোকুলের সুন্দরী স্ত্রী বাড়ীতে এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গিয়েছিল, কিন্তু যথা সময় ননদের দৃষ্টি পড়াতে—সে দুর্ঘটনা ঘটেনি······

বাংলা দেশ ভাগ হ'য়ে গেল। ভাগ না করার প্রস্তাবে একদিন যে রক্তপাত হয়েছিল, ভাগ করার প্রস্তাবে তার চাইতে বেশী রক্তপাত হ'ল······

দলে দলে লোক পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ ক'রে পশ্চিম-বঙ্গে চলে আসতে লাগলো। যারা রইল—তারা পূর্ব্ববঙ্গের নিদারুণ ঘটনার পর আর দেশে থাকতে পারলো না,—স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লো নিরুদ্দেশ যাত্রায়। প্রথম দিকে যারা এসেছিল—তারা অন্ন-আশ্রয় সবই পেয়েছিল, কিন্তু—শেষের দিকে যারা এল, শোনা যায়, তারা উপবাস আর উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া আর কিছুই পায়নি। আন্দামানে গেল কিছু,—আন্দুলে গেল কিছু,

লিলুয়ায় কিছু, লাহেরিয়াসরায়ে কিছু। সুরু হ'ল বাঙালীর পরিচয় লোপের উৎসব। কিছু মাদ্রাজে গেল, কিছু গেল উড়িষ্যায়, কিছু মধ্যপ্রদেশে, কিছু উত্তর-সীমান্তে।···ত্রিশ বছর পরে হয়তো এদের ছেলেরা ভাঙা বাংলায় বলবে,—ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি আমার দাদু এসেছিলেন নাকি বাংলাদেশ থেকে।

শেষের দিকে এল শোভনা, সঙ্গে তার বৃদ্ধা শাশুড়ী ও প্রৌঢ় স্বামী। সনাতন রায়চৌধুরী কিছুদিন থেকে বাতে কষ্ট পাচ্ছেন। শোভনা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে শোভনা হক্-চকিয়ে গেল। বাপ্‌রে! কী মস্ত বাড়ী! আর লোকই বা কতো? ষ্টেশনের মেঝেতে একখানা সতরঞ্চি পেতে তার ওপর ট্রাঙ্ক, সুটকেশ ইত্যাদি রেখে সনাতন মাকে নিয়ে আরাম করে বসলো। জল খেতে হবে, তেষ্টা পেয়েছে।

এদিক ওদিক চেয়ে সনাতন বৌকে বললো—

—শোন্‌তেছো! ঘটিডা লইয়া এট্টু বাইরাইয়া ছ্যাখোতো—এট্টুখানি জল পাওন্ যায় কিনা!

—আমি কই যাইমু! ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো শোভনা।—আমি মাইয়া লোক!

—কইছে কে? বৃদ্ধা শাশুড়ী টিপ্পনী কাটলেন।

—নছল্লা করিচ্‌না। যা জল লইয়া আয়! স্বামীর হুকুম।

অগত্যা একটি ঘটি হাতে নিয়ে শোভনা ষ্টেশন থেকে নামলো। বাপ্‌রে বাপ, কত লোক! কেউতো কারো দিকে চায়না মোটে! কথা কই কার সঙ্গে?···এদিকে গেল শোভনা, ওদিকে গেল শোভনা, কিন্তু কোথায় জল?

হঠাৎ চোখে পড়লো—দূরে একটি পাঞ্জাবী পরা যুবক তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হাজার হোক পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে, পশ্চিমবঙ্গের মেয়ের চাইতে তার সাহস একটু বেশী হবেই। অতএব সে ওই লোকটির দিকেই এগিয়ে গেল।

—একটু জল—মৃদু কণ্ঠে বললো শোভনা।

—জল? জল নেবেন? আসুন আমার সঙ্গে! বলে লোকটি এগিয়ে গেল। শোভনা চললো তার পেছনে পেছনে।

—আপনারা এই গাড়ীতে এলেন বুঝি? শোভনা মাথা নাড়লো।

—ভগবান যে আরও কত দেখাবেন! লোকটি বিড়্ বিড়্ ক'রে আপন মনে বকৃতে বকৃতে চললো।—ছি-ছি-ছি! এই সব মা বোনেরা আজ কিনা পথে দাঁড়িয়েছে। উপায় নেই। চোখ থাকলেই দেখতে হয়, কান থাকলেই শুন্‌তে হয়। আসুন! এই যে কল!

একটি মেয়ে সেইমাত্র জল নিয়ে কলটি ছেড়ে দিয়ে গেল। কলের সামনে গিয়ে শোভনা ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে চেয়ে রইল।—এই যে এইভাবে ধরুন! লোকটি মৃদু হেসে কল টিপে ধরতেই ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো। বিস্ময়ের শেষ নেই শোভনার। স্থান কাল পাত্র ভুলে সে লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। এরই নাম সহর। এরই নাম কোলকাতা। যখন ইচ্ছে তুমি ওইটে ধরে টানো, পাতালপুরী থেকে বাপ্ বাপ্ বলে জল উঠে আসবে। সাধে কি লোকে এখানে থাকে? তা' নয়, রাত বারোটায় সেই পুকুর ঠেঙিয়ে, সাপ বাঘ ভূতের মাঝখান দিয়ে জল আনতে হবে। রাম রাম! দেশে আর যাবে না শোভনা।

ভরা ঘটি নিয়ে শোভনা শাশুড়ীও স্বামীকে অনেক খুঁজলো। কিন্তু এই জনারণ্যে কোথায় যে তাঁরা বসে আছেন সতরঞ্চি পেতে, বাক্‌সো টাক্‌সো

নিয়ে, তার কোন খোঁজ নেই। লোকটি এতক্ষণ বোধ হয় পেছনেই ছিল। এইবার একটু হেসে এগিয়ে এসে বললো—

—খুঁজে পেলেন না তো? এইবার আসুন আমার সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁদের কাছে পোঁছে দিচ্ছি। এর নাম শ্যালদা—বুঝেছেন? আসুন!

সরল বিশ্বাসে শোভনা তার পিছু নিলো।

ঘণ্টাখানেক পরে সনাতন রেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—শারামজাদী গেছে তো গেছেই! সোয়ামীর কথা ভুল্‌গ্যাই গেছে। জলের ঘটি লইয়্যা হাঁ কইর‍্যা কোইল্‌কাত্তার বাহার গ্যাখতে লাগ্‌ছে…

বলেই আবার ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লো…

লোকটির পিছনে পিছনে চলেছে শোভনা। হাতে সেই জলের ঘটি। ছুটো বড় রাস্তা, আর ছুটো গলি পার হ'য়ে সে যখন আবার বড় রাস্তায় এসে পড়লো, তখন একটা অজানিত ভয়ে তার পা ছুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। একি! এত দূরে কেন থাকবেন তার স্বামী আর শাশুড়ী! লোকটা কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে? সে ডাক্‌লো—

—গ্যাখেন!

—উঁ? কী? কী ওল্‌ছেন? দাঁড়ালেন কেন?

—কই লইয়া যাইতেছেন আমারে?

—স্বামীর কাছে। আপনার স্বামীর নাম তো সনাতন রায় চৌধুরী?

—হ।

—কোটালীপাড়া থেকে আসছেন তো?

—হ। অবিশ্বাস আর সন্দেহ যেন কেটে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। এত নাম ধাম জানে যখন—! হঠাৎ লোকটা ফিরে দাঁড়িয়ে বললো—

—ওহো! আপনি বোধ হয় ভাবছেন যে, ষ্টেশন থেকে এতদূরে নিয়ে এলুম কেন? ব্যাপারটা তাহ'লে খুলেই বলি। গভর্ণমেণ্ট থেকে নিয়ম হ'য়েছে—একদিনের বেশী ষ্টেশনে কোন বাস্তুহারাকে থাকতে দেবে না। আপনার স্বামীতো অথৈ জলে পড়েছিলেন। শেষকালে আমি আমার একটি বন্ধুকে দিয়ে তাঁদের পাঠিয়ে দিয়েছি একটা বাড়ীতে। আমারই বাড়ী অবিশ্যি। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি।—কেন? আপনারা বসে থাকতে থাকতে কতকগুলো ব্যাজ্ পরা লোককে উদ্বাস্তুদের তদারক করতে দেখেননি?— দেখ্ছি মনে লয়। না বুঝেই শোভনা জবাব দিলো। তারাই সবাইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় কোন্ তেপান্তরে পাঠাবে, তাই আমি নিজেই যাহোক্ ব্যবস্থা করেছি একটা। আসুন! এই বলে লোকটি আবার চলতে লাগলো।

শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় নম্র হ'য়ে এলো শোভনার চিত্ত। সহর জায়গা, সভ্য জায়গার গুণই আলাদা। কত সব পরোপকারী লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে সহরের অলিতে গলিতে। ভাগ্যিস্, জল নিতে এসে দেখা হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে! নইলে আজ হয়েছিল আর কি!

আরও দু' একটি গলি পার হ'য়ে ওরা এসে দাঁড়াল একটি মাঠ-কোঠার সামনে। লোকটি বললো—আসুন! লজ্জা ক'রে লাভ কী?

তবুও শোভনা ইতঃস্তত করছে দেখে লোকটি এবার ধমক দিলো—

—রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে ইয়ার্কী মারবার আমার সময় নেই। আমি কাজের লোক। আসবেন তো আসুন! ব্যস্। যা কিছু সন্দেহ ছিল শোভনার মনে, এই ধমকে সবটা নিঃশেষ হ'য়ে গেল। খারাপ

মতলব থাকলে কি কেউ বকতে পারে? সে নিঃসংকোচে লোকটির পিছু পিছু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। দাওয়ায় বসে দাঁত খুঁটছিলেন একটি স্থূলকায়া প্রৌঢ়া। তিনি লোকটিকে দেখে একগাল হেসে বললেন—
—ওমা! নবীন যে! তুই এসময় কোত্থেকে এলি রে মড়া? সঙ্গে কে? বাঃ! বাঃ! এতো দেখছি—হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।
—সনাতন বাবু তাঁর মাকে নিয়ে এখনো এসে পৌছোননি মাসী? নবীন প্রশ্ন করলো।
—না তো! তাই তো বসে বসে ভাবছিলাম ভাই! বলি, পথে ঘাটে কোন অসুবিধে হলনা তো? সহর কোলকাতা—
—না-না। সে ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর পঞ্চাশ। অসুবিধে হলেই হ'ল? ন্যাও, এখন ওরা কোন্ ঘরে থাকবে—বলে দাওতো! আমি ছুটি নিই। বা-ব্বাঃ! এসব কাজ কি আমাদের পোষায়?
আবার সেই মধুর হাসি প্রৌঢ়ার। আরও মিষ্টি ক'রে বললেন—ওই পশ্চিম দিকের ঘরখানাই এখন খালি। ওইটেই দিগে যা!
—আসুন! লোকটি আবার ডাকলো শোভনাকে।
একদম খালি ঘর। এক কোণে ছোট একটি মাটির কলসী, মুখে পিজ্ বোর্ড ঢাকা, আর তার কাছে একটি পিতলের গেলাস উবুড় করা।
—নিন্! এই আপনাদের ঘর। গো-জন্মে আমি খালাস বাবা! ওঁরা এক্ষুণি এসে পড়বেন। আপাততঃ দু'চারদিন আপনাদের খাওয়া দাওয়ার সব মাসীই ব্যবস্থা ক'রে দেবে, আমার বলা থাকলো। কেমন?
—আইচ্ছা। বললো শোভনা। কিন্তু তার যেন রাস্তার সেই ভয় ভয়টা আবার ফিরে আস্‌ছে। তার স্বামী শাশুড়ী যদি আগেই চলে এসে থাকেন, তাহ'লে তাঁরা পিছিয়ে পড়লেন কেন? তাছাড়া রাস্তা যদি এক

হয়, তাহ'লে পথেই বা দেখা হ'ল না কেন? কী রকম যেন ব্যাপারটা। লোকটাই বা পালাবার জন্য অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে কেন? ভাবতে ভাবতে হাতের জল ভরা ঘটিটা মেঝের উপর রেখে শোভনা কোণের তক্তাপোষের ওপর গিয়ে বসলো।

লোকটি অর্থাৎ নবীন, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভনাকে দেখছিল,—এইবার বললো—তাহ'লে এবার আমি যাই? কোন ভয় নেই, যা দরকার পড়বে, চাইলেই মাসী দিয়ে যাবে।

—আপনের আপন মাসী? শোভনা প্রশ্ন করলো।

—আপন পর জানিনে, হাসলো নবীন,—তবে জ্ঞান হওয়া এস্তোক্ ওকেই মাসী বলে জানি। সবাই জানে। ইয়ে—খিদে পেয়েছে কী?

—না। বললো শোভনা।

—তাহ'লে আমি চলি। আপনার স্বামী আর শাশুড়ী এলে তাঁরাও এই ঘরেই থাকবেন। আমি যদি পারি, সন্ধ্যার সময় আসবো। এই বলে নবীন চলে গেলো।…একটু পরেই কী একটা কথায় মাসী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। নবীনকে বলতে শোনা গেল—আঃ! কি হচ্ছে? যত বয়স বাড়ছে, ততই যেন ঢং বাড়ছে—না?

চুপ চাপ। মাসীর সঙ্গে কেউ নাকি এই ভাবে কথা কয়? আপন মাসীর সঙ্গে? মায়ের আঁপন বোনের সঙ্গে? তিনি তো সম্পর্কে গুরুজন! কী জানি বাবা!…তক্তাপোষের উপর একটা বিছানা পাতা। খুব ফর্সা চাদর না হ'লেও সাবান কাচা। পাশাপাশি দু'টি বালিশ। বসে থাকতে থাকতে শোভনার যেন ক্লান্তি বোধ হ'তে লাগলো। সে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো। ঝিম্ ঝিম্ করছে শরীরের মধ্যে। ওঃ! কতদিন, কতকাল

ধরে যে হাঁটছে শোভনা, তার আর লেখাজোখা নেই। কতকাল! ক—ত—কা—ল!

মজা হলো মন্দ নয়। কোথায় সে স্বামী আর শাশুড়ীর সঙ্গে একসঙ্গে এ ঘরে এসে উঠবে, তা' নয় নিজেই আগে ভাগে এসে হাজির হলো। তাকে এখানে দেখে স্বামী রাগ করবেন—এটা ঠিক, তবে যদি—। হ্যাঁ ঠিক হ'য়েছে। ওঁরা আসবার পূর্ব্বেই সে যদি ঘর-দোর পরিষ্কার ক'রে রাখে, তাহ'লে এসে দেখে নিশ্চয় খুসী হবেন ওঁরা। এই ভেবে শোভনা তক্তাপোষ থেকে নেমে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে মন দিল······

কিন্তু এক ঘণ্টা গেল, দু' ঘণ্টা গেল--কোথায় স্বামী আর শাশুড়ী। একটা ভয়ংকর ভয়ে হঠাৎ শোভনার হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। তাকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে আসেনিতো? দেশে থাকতে কিন্তু এরকম অনেক গল্প শুনেছে সে। সুন্দরী অল্প বয়সের মেয়েদের নাকি বিপদ পদে পদে কোলকাতায়। নাঃ! একবার মাসীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

ঘর থেকে বেরিয়ে শোভনা গিয়ে মাসীর রান্নাঘরের কাছে দাঁড়াল। দেখলো তিনি খেতে বসেছেন। আস্তে আস্তে মুখ বাড়াতেই মাসী প্রশ্ন করলো—কী গো মেয়ে?

—আমার শাশুড়ী আর সোয়ামীর আসনের কথা আছিলো। য়্যাহন্ তক্ আস্লো না ক্যান্—তাই জিগ্‌গাই। মৃদু কণ্ঠে বললো শোভনা।

—ওমা! তা' আমি ক্যামোন ক'রে বলবো গো? সে সব তো নবীন জানে।

—হেই বা গেছে কই?

—তা' বলতে পারবো না। পুরুষ মানুষ, বাইরে যাবে আসবে, অত খোঁজ রাখলে কি চলে? অধৈর্য্য হয়োনা বাছা। সে আসবেই। মাসী হেসে বললো।—মোক্ষদা তোমার ভাত নিয়ে যাচ্ছে— খেয়ে নাও।
খেতেই হ'লো। উপায় কি? না খেয়েই বা থাকা যায় কতক্ষণ? লোকটা বলে গেছে যখন, তখন নিশ্চয় আসবেন তার স্বামী আর শাশুড়ী। মাসী ঠিক কথাই বলেছে, অধীর হ'য়ে কোন লাভ নেই। আস্তে আস্তে ভাত ক'টি যখন সব খেয়ে ফেলেছে শোভনা, তখন ঘরে ঢুকলো তারই বয়সী আর একটি মেয়ে। শোভনা তার দিকে যেন আর চোখ ফেরাতে পারলো না। এ কী চেহারা! চোখে কাজল পরেছে কেন? ঠোঁটে ও কী? আল্‌তা? কেন? আল্‌তা কেন ঠোঁটে?
—তুমি আল্‌তা প'রছো ক্যান্ ওষ্ঠে? শোভনা বললো।
—আল্‌তা নয়---লিপ্ ইস্‌টিক্। তুমিও পরবে।
—আমি? ক্যান্ পরুম্?
—ঠোঁট লাল করতে হবে না?
—ঠোট লাল—না, না, আমি ও সব পারুম্ না। আমি ক্যান্ পরুম্? আমার সোয়ামী আর শাশুড়ী আস্‌লেই—
মেয়েটি মুচকে হাসলো। বললো—স্বামী আসে রাত্রে। দিনে কি আমাদের স্বামী আসে ভাই? আর শাশুড়ী তো আমাদের মাসী! মাস্ শাশুড়ী। না?
—কী কথা কও? কই থাকো তুমি? শোভনার স্বরে বিরক্তি।
—ঠিক তোমার পাশের ঘরেই। আবার মুচকি হাসলো মেয়েটি।
এবার রেগে উঠলো শোভনা। রাগ ক'রে উঠে বাইরে গিয়ে আঁচিয়ে এল। তারপর তক্তাপোষের উপর বসতে গিয়ে আবার নেমে এঁটো

বাসন কোশন নিয়ে বাইরে রেখে এল। মেয়েটি এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে দেখছিলো তাকে। এইবার মিষ্টি গলায় বললো—রাগ ক'রে কোন লাভ হবে না ভাই। আজ থাকবে, কাল থাকবে, পরশু আর রাগ থাকবে না। অমন হয়। হ'য়েই থাকে। আমারও হ'য়েছিল।

—কি ছালির কথা কইতেছ? আমি তো বুজি না কিছুই! সন্দিগ্ধা শোভনা উত্তর দিল।

—তুমি রাগ করছো কেন ভাই? কে এল এই ঘরটায় তাই দেখতে এলুম। আর কেউ আসেনি তোমার সঙ্গে?

—নাঃ। বললো শোভনা।

—আসবে বিকেলে সবাই অনেকগুলো মেয়ে থাকি আমরা এখানে। তার মধ্যে আমি আর শ্যামা থাকি তোমার দু'পাশে। আমার নাম সোণা। আচ্ছা, এখন শুয়ে পড়ো। মাসী বলেছে তোমাকে একখানা কাপড় দিতে। বিকেলে দিয়ে যাব, আর অমনি তোমার চুলটাও বেঁধে দিয়ে যাব। কেমন?

—না না ও সব লাগবো না। কাপড় আমার আছে বাক্সের মধ্যে। আমার সোয়ামী আস্‌লেই—

—বোকা মেয়ে কোথাকার! সোণার এবারকার হাসিটা ম্লান। কিছুই বুঝলো না শোভনা। সোণা যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘরটায় অল্প অল্প অন্ধকার। দেশের বাড়ীর ঘরের মতো। শুয়ে পড়লো শোভনা। হঠাৎ যেন চেতনার একটি অবরুদ্ধ দ্বার খুলে গেল। কী যেন ঘটছে একটা, সে বুঝতে পারছে এবার। কিছু ঘটছে জীবনে। সারা দেহ কাঁপিয়ে অকস্মাৎ একটি কান্নার বেগ এলো। কান্নায় কাঁপছে গোটা দেহটা……

অজস্র কান্না···অনন্ত কান্না···অফুরন্ত জলের স্রোত নামছে দু'চোখ বেয়ে। বালিশটা ভিজে গেল। কোথায় যেন একটা শব্দ হ'ল। এক কাজ করলে হয় না? পালিয়ে গেলে হয় না? কিন্তু পালিয়ে যাওয়াতো সহজ কথা নয়। সেই যাকে বলে শিয়ালদহ ষ্টেশন। কোন্ রাস্তা দিয়ে সে এসেছে—তাই তো মনে পড়ছে না! তবে—পথে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয় বলে দেবে পথটা।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলতে গিয়ে শোভনা বুঝলো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। একি! দরজায় শেকল তুলে দিয়ে গেল কে? তাহ'লে বোধ হয় সোণা বলে ওই মেয়েটা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু কেন? সেতো কোন দোষ করেনি। তার স্বামী আর শাশুড়ীর আসবার কথা এখানে। তাঁদের আসতে দেরী হচ্ছে, তাই—। কিন্তু শেকল দেবে কেন তাই বলে?

ভীষণ ক্লান্তি। অপরিসীম ক্লান্তি। আবার ফিরে এসে শোভনা বিছানায় শুয়ে পড়লো। আর ভাবতে পারছে না সে। যা হবার হোক। যা হবার হোক। এই তার বয়েস আঠারো। ভারী দুঃখী বাপমায়ের সন্তান সে। তার ছোটবেলা থেকেই মায়ের অসুখ। ছোট ছোটি ভাই-দের সেই কাঁধে ক'রে মানুষ ক'রেছে। গালাগালি খেয়েছে, মার খেয়েছে বাপের কাছে—এক হাতে চোখের জল মুছেচে, আর হাতে কাজ ক'রেছে। তারপর হঠাৎ একদিন তার স্বামী এলেন কি একটা কাজে তাদের গ্রামে, ও তখন পুকুর থেকে জল নিয়ে ফিরছিল। চোখোচোখী হ'তেই ও একটু দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মাথা নীচু ক'রে বাড়ী চলে এসেছিল। কিন্তু তখনও সে বুঝতে পারছিলো যে ভদ্রলোক পুকুরঘাটে চুপ ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেইদিন বিকেলে কায়েত পাড়া থেকে এলো বংশীধর কাকা। বাবাকে যেন কী সব বললো, এবং তার সাত দিনের মধ্যেই শোভনার বিয়ে হয়ে গেল। তার দোজবর স্বামীর সঙ্গে।

উঠান থেকে নানা রকমের শব্দ ভেসে আসছে। এটা কার বাড়ী? কেমন বাড়ী? এখানে মেয়েরা চোখে কাজল পরে কেন? ঠোঁটে আলতা দেয় কেন? খুব বিচিত্র! অনেক দিন আগে সে তার মামার বাড়ী কালুখালিতে সংএর নাচ দেখেছিল, তাতে ছেলেরা মেয়ে সেজেছিল ওই রকম ঠোঁট আলতা দিয়ে। কী যে অদ্ভুত দেখায়, তা'······ শোভনা ঘুমিয়ে পড়লো।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ঘুম ভাঙলো শোভনার। কোথায় সে? দেশের বাড়ীতে? শিয়ালদহ ষ্টেশনে? তবে? তবে? ও—হো! মনে পড়েছে! কিন্তু—নাঃ! কিছুই তো মনে পড়ছেনা! সে কে? সে শোভনা। দেশ ভাগ হওয়ার জন্য—তারা চলে এসেছে নদী পার হ'য়ে। ইষ্টিশনে পড়ে ছিল সবাই···সে জল আনতে গিয়েছিল, একটা লোক তাকে—!

এইবার, এতক্ষণ পরে শোভনার দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো। সব মিথ্যা, সব ফাঁকি। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এরা। এটা নিশ্চয় খারাপ বাড়ী। ছেলেবেলায় সে শুনেছিল—যে সহর কোলকাতায় মেয়ে চুরী ক'রে চা বাগানে চালান দেয়। নিশ্চয় তাকেও এরা চা বাগানে চালান ক'রে দেবে। সেখান থেকে আর এক জায়গায়···আর এক জায়গায়, এমনি ক'রে হাতে হাতে ঘুরতে হবে তাকে—এরপর। শোভনার কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগলো······

বাড়ীটার মধ্যে কারো বিয়ে হচ্ছে নাকি? কোন ঘর থেকে হাসি হল্লা, কোন ঘর থেকে গান নাচ, কোন ঘর থেকে জড়ানো জড়ানো কথা আর গালাগালি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এরই মধ্যে একটা মেয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো……

শীতের সকালে স্নান ক'রে উঠলে যেমন ক'রে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, —তেমনি কাঁপছে শোভনার দেহ, দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক্ ঠক ক'রে…। এ কী! জ্বর আসছে নাকি? ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে হাতে পায়ে…উঠতে গেলেই পড়ে যাবে সে……

কিন্তু এরই মধ্যে…এই দুর্য্যোগ, দুর্ভাবনা আর দুঃখের মধ্যেও চিন্তার মধ্যে আর একটি উল্টো স্রোত বইছে।…বাঁচা গেছে…এবার সে নিজে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। বৃদ্ধ স্বামীর রাত্রে হাঁপানী উঠলে আর রাত জেগে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে হবে না। আশী বছরের বুড়ো শাশুড়ীর তীব্র তীক্ষ্ণ চিম্‌টি কাটা কথা শুনতে হবে না। তার দোষ কী? সে কেন এই বয়সে দুটো বুড়ো মানুষের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে? বেশ হ'য়েছে! পান থেকে চূণ খস্‌লেই অমনি ফোঁস্?

কিন্তু সবই তো হ'লো। কী দিতে হবে তাকে এই স্বাধীনতার বিনিময়ে?…আবার সেই মেয়েটা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। এই কি পরিণাম? তাদের দেশে যখন এই কথা যাবে, তখন তার বাপ মা আর স্বামীর কী অবস্থা হবে? সবাই ছি-ছি করবে,—আর তাঁরা মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকবেন। অজানা…অচেনা…অভাবিত জীবন। এখানে কী দিয়ে ভাত খায় মানুষ—তাও তো সে জানে না!…না—না না—না! অব্যক্ত স্বরে ভিতর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো।

এখনো সময় আছে শোভনা, পালিয়ে যাও—পালিয়ে যাও—যাও পালিয়ে!···ভোরে উঠে—কেউ জাগবার আগেই পালিয়ে যেতে হবে। ···এখন পালানো অসম্ভব···আজ তার দেহে মনে একটুও বল নেই··· কী আশ্চর্য্য! সে যে এ ঘরে অন্ধকারে একা পড়ে আছে, এ কথা বাড়ীর কেউ না জানুক, মাসী তো জানে! না একটা আলো,—না একটু খাবার ···না দুটো মিষ্টি কথা···না স্বামী···না শাশুড়ী···না নবীন···

নিজের অজান্তে কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়লো শোভনা···

অনেকদিন পরে মহিমদা'র সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে। সে উঠে আসছে জল নিয়ে, মহিমদা নামছে ঘাটে, গায়ে সেই ডুরে কাটা গামছা, হাতে সাবানের বাক্স। শোভনাকে দেখে থমকে দাঁড়াল মহিমদা। চোখে ফুটলো বিস্ময়ের রেখা। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—

—শোভনা—না?

—হ। মধুর হেসে বললো শোভনা—তুমি কবে আইলা মহিমদা? ভাল আছ তো?

—ভালই আছি। আমি কাল্‌কে এসেছি রাত্রে। তুমি—

—হ। আমি এহানেই। শ্বশুর বাড়ীথন্ লোক আইবো সাত দিন পরে।

—সাতদিন পরে? মহিম মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করলো।

—হ, সাতদিন পরে। ক্যান্? তুমি আইবা নাকি আমাগো বাড়ী?

—তোমাদের বাড়ী? হ্যাঁ—তা' আসতে পারি।

—আইয়ো কইলাম্। সন্ধার পর। উঁ ?

—হ্যাঁ। সন্ধ্যের পর।

জল নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতে আসতে হাসি পেল শোভনার। কত সহজেই না মহিমদা তার মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে পারলো! অথচ—! মেয়েরা হ'লে পারতো না। সে পারতো না। যদি না মহিমদা আগে কথা কইতো।

গেল বছরের আগের বছর। এই গ্রামেরই পশ্চিম পাড়ায় তার দিদির শ্বশুর বাড়ী। মহিমদা, দিদির কেমন-যেন সম্পর্কে দেওর। কোলকাতায় থাকে। সে, মা আর বাবা গিয়েছিল দিদির ছেলের অন্ন-প্রাশনে। দিদির বিশেষ অনুরোধে দু-দিন আগে গিয়েছিল তারা। সেইখানেই আলাপ মহিমের সাথে। আলাপ এবং পরিচয়। অন্ন-প্রাশনের আগের দিন রাত্রে ভয়ানক গরম লাগছিল বলে শোভনা ছাদে উঠে একলা চুপ ক'রে বসেছিল। আজই দিদি আর মায়ের কথাবার্ত্তা সে শুনেছে। সে আর ছেলে-মানুষ নয়। পনেরো পেরিয়ে সে এই ষোলয় পা দিয়েছে। তাকে নিয়ে যে বাপ মায়ের মনে শান্তি নেই, এ সে বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু কী করতে পারে সে? বাংলা দেশের পল্লী-গ্রামের মেয়ে, লেখা-পড়া তো বেশী শেখেনি, তবে কী করতে পারে সে? সন্ধ্যাবেলায় মা আর দিদির কথাবার্ত্তা শোনবার পর থেকে তার মনটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খানিকটা কাঁদবার জন্যই সে ছাদে উঠে এসেছিল। কিন্তু—

পাশে শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলো, মহিম এসে আস্তে আস্তে বসলো। যদিও মাত্র একদিন হ'ল তার আলাপ হ'য়েছে মহিমের সংগে, তবু

এই অন্ধকার রাত্রে মহিমকে কাছে পেয়ে বেশ ভালই লাগলো শোভনার, সে পাশে চেয়ে ধরা গলায় প্রশ্ন করলো—

—কী মহিমদা?

—না কিছু না, এমনি। দেখলাম—তুমি একলা বসে আছো, তাই এলুম।...এই বলে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে শোভনার হাত দুটি চেপে ধরলো মহিম। খুব না চমকালেও একটু অবাক্ হ'য়েছিল বৈকি শোভনা। চাপা গলায় বললো—কীঃ?

—শোভনা! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমাকে দেখা অবধি, তোমার সংগে কথা কওয়া অবধি, আমি মনে মনে পাগল হ'য়ে গেছি,—তুমি কথা দাও শোভনা যে আমাকে বিয়ে করবে?

কোথায় যেন কলের গান বাজছে......অন্য কোথাও নয়, তার রক্তে... অতি সুন্দর মিষ্টি সুরে কে যেন গান গাইছে। ঠক্ ঠক্ ক'রে গা হাত পা কাঁপছে শোভনার।

—আমি পরশু কোলকাতা যাচ্ছি। দিন পনেরো বাদে ফিরে এসেই তোমার বাবার কাছে পাড়বো কথাটা। কেমন?

শোভনা জবাব দেবে কি, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়েই রইল মহিমের দিকে। এ ব্যাপার সে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। অসম্ভব! বানানো কথা। অবশ্য তার রূপ আছে—একথা শত্রুও স্বীকার করে, কিন্তু মহিমের মত ছেলে তাকে বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে? তার বাবা তো কোন টাকাকড়ি দিতে পারবেন না......

জলের কলসী নিয়ে বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো শোভনা। গোঁসাই বাড়ীর থামের মাথায় দুটো পায়রা মিলে কী আদরটাই করছে দুজনে

দুজনকে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। দেরী করলে চলবে না। বাবার সেই বাতের ব্যথাটা বেড়েছে, সেঁক দিতে হবে···মায়ের—তাহ'লে মহিমদা আবার এসেছে গাঁয়ে? কত সহজেই না বললো শোভনা তাকে বাড়ীতে আসতে। যেন মহিম না এলে আজ রাত্রে ঘুমই হবে না তার···

হ্যাঁ। সেই অন্ন-প্রাশনের রাত্রি সে জীবনে ভুলবে না। সমস্ত দিন ধরে লোকজন খেয়েছে···রাত্রেও খেয়েছে বেশ কিছু। সেদিন দক্ষিণের ভিটের ছোট ঘর খানিতে একলাই শুতে হ'য়েছিল তাকে। রাত্রের খাওয়া দাওয়ার তদারক করে বাবা চলে গিয়েছিলেন বাড়ী; মা গিয়ে শুয়েছেন দিদির ঘরে খোকাকে নিয়ে। দিদির শরীর খারাপ হওয়াতে এই ব্যবস্থা।

রাত্রি দুটো বেজে গেছে···

উৎসবের বাড়ী নিঃঝুম। যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে···উঠানের কোণে স্তূপাকার শালপাতা আর কলাপাতা—গোটা চারেক কুকুর তাই নিয়ে রাত্রি জাগছে। কাঁঠাল গাছ তলায় ভিয়েন বসেছিল লোকজন শূন্য ফাঁকা উনুনে এখনো আগুন গস্ গস্ করছে। বাইরে বেরিয়ে শোভনা লক্ষ্য করলো—সদর দরজাটা খোলা। এগিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে সে যখন ঘরে ফিরছে, পেছন থেকে ফিস্ ফিস্ ক'রে ডাক শুনলো—

—শোভনা!

অত্যন্ত ভয় পেয়ে শোভনা পেছনে চেয়ে দেখলো—মহিম। সে দাওয়ার উপর চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল, শোভনা থামতেই এগিয়ে এল। ভয়ে শোভনার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু ঢোঁক গিলে বললো—

—কও!

কোন কথা না বলে মহিম দ্রুত পদে আরও এগিয়ে এসে শোভনার ডান হাতটি চেপে ধরে বিদ্যুৎ বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল শোভনার মনে হ'ল—তার গলায় যত জোর আছে—তত জোরে চীৎকার ক'রে লোকজন ডাকে···। কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হ'ল—যদি তার কথা কেউ বিশ্বাস না করে। যদি এই নিয়ে কেলেংকারী হয়। যদি—! যদি—!

জল নিয়ে যেতে যেতে—নিজের মনেই হাসলো একটু শোভনা।···যাই বলো আর তাই বলো—মহিমদার সাহস আছে বলতে হবে। ···অবশ্য তারপর দিন খুব ভোরেই মা তাকে নিয়ে চলে এসেছিল বাড়ীতে। সব চাইতে মজার ব্যাপার যে এই ঘটনার দিন কুড়ির মধ্যেই তার বিয়ে হ'য়ে যায়!···প্রৌঢ় স্বামীকে দেখে পাড়ার লোকে অনেকে অনেক কথা বলেছিল,—কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিয়ে তো হ'ল তার।

শোভনা স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ। নতুন বধূর আদর যত্ন এবং স্বপ্ন সব কটিরই অভাব ঘটলো। তা' ঘটুক। ফুলশয্যার রাত্রের কথা পরিষ্কার মনে আছে শোভনার। বাড়ীর পাশের একটি মেয়ে, সম্পর্কে ননদই হবে বুঝি বা—তাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলো। দুরু দুরু বুকে সে যখন ঘরে ঢুকলো,—দেখলো,—স্বামী তামাক খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। শোনা যায় বিয়ের দুদিন আগে হাঁপানীর খুব টান উঠেছিল, তাইতেই শরীরটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে নাকি।

পেছন ফিরে ঘরের দরজটা বন্ধ ক'রে দিলো শোভনা। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। সন্তর্পণে উঠে গিয়ে স্বামীর পাশে শোবে? না,—এই মেঝেতেই যা হোক একটা কিছু পেতে নিয়ে রাতটা

কাটিয়ে দিবে ? হ্যারিকেনের আলোতে ভয়াবহ দেখাচ্ছে স্বামীর মুখ। জীবনের পোড় খাওয়া বলী-লাঞ্ছিত মুখমণ্ডল। সেই দিকে চেয়ে থাকতে একটা অব্যক্ত ব্যথায় শোভনার বুকের মধ্যেটা টন্ টন্ ক'রে উঠলো। সারাটাজীবন এই বৃদ্ধকে নিয়ে ঘর করতে হবে ? উনি জীবন ভোগ শেষ করেছেন, তার এখনো সুরুই হয়নি। যে মহিমদা তার অত বড় সর্ব্বনাশ করেও কথা রাখেনি, কোলকাতায় গিয়ে পালিয়ে রইল, —তবুও তার উপর এই মুহূর্ত্তে রাগ হচ্ছে না শোভনার। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে তিরস্কার করলো—এ কী চিন্তা ! যে দয়াবান মহৎ এগিয়ে এসে তার বাবাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনি তার প্রণম্য। সে সারা জীবন মুখ বুঁজে তার সেবা করবে। তিনি মানুষ নন— দেবতা। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত বল পেল শোভনা।

... ... মাঝ রাত্রের আধো ঘুম ভেঙ্গে সে বুঝতে পারলো স্বামী তাকে আপন বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছেন...। ...উঃ ! দম বন্ধ হয়ে আসছে শোভনার, কিসের যেন একটা তীব্র গন্ধ...বমি আসছে তার...। ইস্‌পিরিটের মতো যেন গন্ধটা...। প্রকাণ্ড ভীমকায় এক অজগর যেন ভীরু হরিণীকে অক্টোপাশের বাঁধনে বেঁধে প্রবল বলে নিষ্পিষ্ট করছে। অনেক কষ্ট পেয়েছে শোভনা...এইবার তার দুঃখ কষ্টের অবসান...স্বর্গ নেমে এসেছে তার বুকের উপর...। এ আনন্দ ভোগ লুকিয়ে লুকিয়ে ভিক্ষে ক'রে নয়, এই দুর্ল্লভ আনন্দ ভোগ করবার অধিকার সমাজ তাকে দিয়েছে...সমাজ দিয়েছে ! হ্যাঁ ! কিন্তু সেই তীব্র বিকট গন্ধটা আর তো নাকে লাগছে না...কী আশ্চর্য্য ! তার বৃদ্ধ স্বামীর...রুগ্ন স্বামীর দেহে

আজ মত্ত মাতঙ্গের বল এলো কোত্থেকে? ...মধু মধু...মধু...তুমি আমি মধুময়...জীবন মধুময়...বাংলা ভাগ মধুময়...মহিমদা মধুময়...আনন্দানুভূতির অতল-স্পর্শ মহাসাগরে ডুবে যাচ্ছে শোভনা...তল নেই...জল নেই...শেষও নেই...সে বোধ হয় মরে যাচ্ছে ...মৃত্যু নইলে দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ক'রে মাধুর্য্য বিস্তার আর কে করবে?

চট্ ক'রে ঘুম ভেঙ্গে গেল শোভনার। ঘুম চোখে সে উঠে বসলো বিছানার উপর। কোথায় যেন সেই কলের গানটা বাজছে আবার। চেয়ে দেখলো...যদিও ঘোর অন্ধকার...তবুও সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন শোভনা তার তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখতে পেলো—সে তার স্বামীর কাছেই শুয়ে আছে......! নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোভনা আবার তৎক্ষণাৎ ধুপ ক'রে শুয়ে পড়লো...। গভীর আলস্য ভরা দেহ...পাশ ফিরে বাঁ হাত দিয়ে পরম প্রেমে সে জড়িয়ে ধরলো স্বামীর কণ্ঠ......

খুব ভোরে উঠে শোভনার পালিয়ে যাওয়া হ'ল না, কেন না সে তখনো ঘুমুচ্ছে...ভোরের আলো ফোটবার আগেই নবীন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শোভনা তখনো স্বপ্নাতুরা... ।...রোজ রোজ ভোর রাত্তিরে উঠে গায়ে হাতে পায়ে কোমরে ভয়ানক ব্যথা হ'য়েছে। ...আজ আর সে অত ভোরে উঠতে পারবে না...সকালের কাজগুলো শাশুড়ীই সেরে নিক্......

অবিনশ্বর অবিনাশ

দেবীপুরের অবিনাশ চৌধুরী এই গল্পের নায়ক। ধন সম্পত্তি বলতে তার কি আছে, সে কথা বলবার পূর্বে, তার পিতৃপুরুষগণের কি ছিল, সে কথা আগে বলা দরকার। নইলে এ গল্পের মেরুদণ্ড যাবে বেঁকে, এবং সত্য ঘটনার মধ্যে দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করবে।

অবিনাশের প্রপিতামহ যদুনাথ চৌধুরী ছিলেন ডাক-সাইটে জমিদার। তাঁর নামে বাঘে গরুতে জল খেত কিনা জানা নেই, তবে রাজায়-প্রজায় বিরোধ ছিল বিরল। তিনি নিজের জমিদারীতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রায় পাঁচশ পুষ্করিণী কাটিয়ে ছিলেন এবং অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য

খুলেছিলেন অন্নসত্র, যেখানে প্রতিদিন তিনশো থেকে চারশো দরিদ্র এসে পেট ভরে খেয়ে যেত। অতএব তাঁর রাজত্বে জলকষ্ট এবং অন্নকষ্ট ছিলনা, এ কথা নির্ভয়ে উচ্চারণ করা যেতে পারে।

জমিদার যদুনাথ চৌধূরীর নামে অনেক গল্প-কথা এখনও চলিত আছে। বর্ষাকালে ভিজে মাটির দাওয়ায় ব'সে বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় দেশের নাতি নাত্নীরা ঠাকুরমাদের মুখে সে সব কাহিনী শোনে। কবে নাকি কোন্ এক শীতের দ্বিতীয় প্রহরে জমিদার বাড়ীর পাশের জঙ্গলে শেয়াল ডাকছিল। যদুনাথ তখন তার খাস কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আলবোলায় অম্বুরী তামাকে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিলেন। ডেকে পাঠালেন খাজাঞ্চীকে; একটু আধটু আফিং খাওযার অভ্যাস ছিল বলে এ সময়টা কেউ তাঁকে কোন রকম বিরক্ত করত না, জমিদারী সংক্রান্ত গভীর চিন্তা তিনি এই সময় করতেন।

খাজাঞ্চী রমাপ্রসন্ন এই অসময়ের আহ্বান শুনে কাঁপতে কাঁপতে হুজুরে হাজির হলেন। যদুনাথ তাঁর পায়ের শব্দ শুনে চোখ না খুলেই গম্ভীর গলায় বললেন—আজ সন্ধ্যে থেকে কেবলই ওরা চেঁচাচ্ছে, একবার দেখে এসতো—ব্যাপারটা কি? কি চায় ওরা?

কর্তার মুখে কর্তৃপদহীন এই বাক্যটী শ্রবণ ক'রে নায়েব রমাপ্রসন্নর অন্তরাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল। বহু কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—কারা চেঁচাচ্ছে হুজুর?

—ওইযে শেয়ালগুলো। বেশী কথা কও কেন?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তৎক্ষণাৎ রমাপ্রসন্ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং একটু পরেই ফিরে এসে বিনীতকণ্ঠে বললেন—গিয়েছিলাম হুজুর।

—হুঁ! বলো! চেঁচাচ্ছে কেন? চোখ বুঁজেই যদুনাথ জিজ্ঞাসা

করলেন। বুদ্ধিমান রমাপ্রসন্ন মনিবের এই সব বেপরোয়া মুহূর্ত্তগুলির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাই কণ্ঠস্বরকে অধিকতর নরম এবং বিনীত করে তিনি বললেন—ওরা আপনারই কাছে নালিশ জানাতে এসেছে হুজুর। ছোট জাত কিনা! তাই আওয়াজটা বেশী ক'রে ফেলেছে!

—হুঁ, কি নালিশ?

—এই বছর শীতে ওরা বড় কষ্ট পাচ্ছে হুজুর, তাই—

—কেন? ব্যাটাদের কিছু নেই নাকি?

—কিছুনা —হুজুর কিছুনা। একেবারে খালি গা। বড় গরীব কিনা, তাই হুজুরের দরবারে কাঁদতে এসেছে।

—বড় চেঁচিয়ে কাঁদে ওরা, বারণ ক'রে দিয়ো। তা' আছে কত জন?

—জন পঞ্চাশেক হবে হুজুর!

—হুঁ। আচ্ছা ওদের একখানা করে শাল আমি মঞ্জুর করলাম। কালই হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে ওদের যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিও কেমন?

—তাই হবে হুজুর। শাল পেলে ওরা আর চেঁচাবে কেন? আচ্ছা আমি তা' হ'লে এখন আসি হুজুর!

—এস।

পরের দিন রমাপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা নিলেন এবং পাশের জঙ্গলে কতকগুলো লোক মোতায়েন করে দিলেন, যাতে একটি শেয়ালও এদিকে এসে না ডাকে। অতএব শেয়াল আর ডাকল না—এবং যদুনাথও বুঝলেন শাল পেয়ে ওরা খুসী হয়ে গেছে। জমিদারী মেজাজ এবং আফিং এর মৌতাত, দু'য়ে মিলে এই অঘটন ঘটালো······

যদুনাথের খামখেয়ালীর আর একটি গল্প দেশে প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসের কোন এক মধ্য-রাত্রিতে অত্যধিক গরমে তিনি ঘুমোতে পারছিলেন না। টানা পাখার হাওয়া যেন গায়েই লাগছে না।
রমাপ্রসন্ন এলেন, এসে বললেন হুজুর এ-হ'চ্ছে টাকার গরম। তিনি জানতেন, সেদিনই বৈকালে তিনটী মহলের আদায় ত্রিশ হাজার টাকা যদুনাথের শয়ন কক্ষেই রাখা হয়েছে।
—ঠিক। যদুনাথ বললেন—এ টাকার গরমই বটে। ওগুলো সব নিয়ে গিয়ে রস্তায় ফেলে দাও তো হে রমাপ্রসন্ন! এ আপদ ঘরে থাকলে আজকে আমার ঘুম হবে না, নিয়ে যাও আপদগুলোকে—নিয়ে যাও। হটাও!
—তবে হুজুর অন্য কোন ঘরে—হাত দুটি জোড় করে রমাপ্রসন্ন নিবেদন করলেন।
—উঁহু। ঘরে নয়—পথে। যে ঘরেই রাখবে, সে ঘরেই তো গরমে কারুর ঘুম হবে না। ও আপদ বিদেয় কর আমার বাড়ী থেকে।
অতএব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমাপ্রসন্নকে আপদ বিদায় করতে হ'ল।

যদুনাথের একমাত্র পুত্র বলরাম চৌধুরী পৈতৃক সম্পত্তির প্রসার ক'রে যেতে পারেন নি। বরং তিনি সারা জীবন দু'-হাতে সেই সম্পত্তি উড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং এই রকম অপব্যয়ের পরেও সত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তিনি যা রেখে গিযেছিলেন, অধস্তন পাঁচ পুরুষের উন্মত্ততা আনবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত।
বলরাম চৌধুরী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। সমস্ত জমিদারীর কার্য্য পদ্ধতিকে তিনি বিলাতী কেতা দুরস্ত ক'রে তুলে ছিলেন। নায়েব,

গোমস্তা, খাজাঞ্চী প্রভৃতি পদগুলি তুলে দিয়ে তিনি ম্যানেজার, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্‌ প্রভৃতি পদের প্রবর্ত্তন ক'রে ছিলেন, এবং চেয়ার টেবিল, সোফা কোচে ভর্ত্তি ক'রে সমস্ত বাড়ীটাতে আধুনিকতার কোন ক্রটিই রাখেন নি।

তাঁরও প্রথম যৌবনের প্রতাপান্বিত জমিদারী চালনার কাহিনী এ অঞ্চলে এখনও শুনতে পাওয়া যায়! নদীর ওপারে তাঁর অনেক কর্ম্মচারী বাস করত। বেলা দশটায় তারা খেয়ে-দেয়ে এপারে আপিস করতে আসত, আর ছ'টার সময় ফিরে যেত। প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রমোদরঞ্জনও বাস করতেন ওপারে। সেদিন বেলা একটার সময় কি একটা ইংরেজী বাক্যের মাঝখানে "অন্‌ দি" হবে, না "টু-দি" হবে, এই নিয়ে মনিবের সঙ্গে তাঁর বেশ খানিকটা কথা কাটা-কাটি হ'য়ে গেল। প্রমোদরঞ্জন গ্র্যাজুয়েট। চাকুরীর খাতিরে ইংরেজী ভাষার এই অপমান তিনি সইতে পারলেন না; কোন মতে রাগ দমন ক'রে তিনি বললেন—স্কুলে আমি একবার এই রকম সেণ্টেন্সে 'টু-দি' লিখে ছিলাম স্যার! হেড্‌মাষ্টার মশায় আমাকে কাণ ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

রাগে আর অপমানে বলরাম চৌধুরীর গৌরবর্ণ মুখ লাল টক্‌টকে হ'য়ে উঠল! শুধু বললেন—হুঁ। অন্যায় করেননি।

সেটা ছিল মাঘ মাস। চারদিকে বেশ কন্‌কনে শীত পড়েছে। রাত্রি আটটার মধ্যেই লোকজন সব খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে যে যার লেপের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, নিতান্ত জীবন মরণ প্রয়োজন না হলে আর সেখান থেকে বেরোয় না। রাত তখন বারটা। বলরাম চৌধুরী তাঁর আপিসে বসে বাৎসরিক হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করছিলেন।

হঠাৎ কি খেয়াল হোলো, খাতা থেকে মুখ তুলে তিনি ডাকলেন—হীরাসিং।

জমাদার হীরাসিং তৎক্ষণাৎ সেলাম ক'রে এসে দাঁড়াল। বলরাম বললেন—প্রাইভেট সেক্রেটারী বাবু কো বোলাও!

—যো হুকুম! বলে হীরা সিং প্রস্থান করল।

শীতের এই গভীর রাত্রে মনিবের আহ্বান পেয়ে প্রমোদরঞ্জন একটু চিন্তান্বিত হলেন। হয়তো হিসাবে কোন ভুল ধরা পড়েছে, কিংবা রায় বাহাদুর উপাধি আদায়ের কোন নতুন ফন্দী কর্তার মাথায় খেলছে, ইংরেজীতে তারই খসড়া তৈরী করতে হবে। এই রকম পাঁচ সাত ভাবতে ভাবতে তিনি নদী পার হ'য়ে বলরাম চৌধুরীর কক্ষে প্রবেশ করলেন।

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?

—হ্যাঁ, বলরাম মুখ না তুলেই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার টেবিল থেকে কলমটা নীচে পড়ে গেছে—সেটা কুড়িয়ে দিন।

কলমটা তুলে দিয়ে প্রমোদরঞ্জন বললেন—কাগজ কলম আনব স্যার?

—না না ব্যস্ত হবেন না।

—দরকারী কিছু—

—না। তেমনি মুখ না তুলেই বলরাম বললেন—আমার কলমটা কুড়িয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি যেতে পারেন এখন।

স্তম্ভিত ভাবে প্রমোদরঞ্জন শুধু একবার বলরাম চৌধুরীর মুখের দিকে চাইলেন। তারপর ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করলেন। অপমানের তীব্রতায় চোখে জল এসেছিল তাঁর। শোনা যায়, তার পর দিনই তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন।

বলরাম চৌধুরীর পুত্র অবনীশ চৌধুরীর উপর ভার ছিল পূর্বপুরুষার্জিত সেই বিপুল সম্পত্তি ব্যয় করার, এবং সেই কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করেছিলেন। নগদ টাকা যা ছিল প্রথম তা' গেল, তারপর গেল স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার। শেষ বয়সে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হ'য়ে স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে সে গ্রামেরই অন্য একটা বাড়ীতে এসে উঠলেন এবং সম্মান ও সম্পত্তির শোকে পাগল হ'য়ে গেলেন। তারপর বছরখানেক কাটবার পর একদিন তিনি সস্ত্রীক পরলোকে প্রস্থান করলেন। ইহলোকে রইল তাঁর পুত্র, পুত্রবধু ও একটি নাতি। এই ভাবে জমিদার যদুনাথের রক্ত-ধারার উত্তরাধিকারীর পৃথিবীতে অস্তিত্ব রইল।

সেই বংশধরই আমাদের গল্পের নায়ক অবিনাশ। সে গাইতে জানে, বাজাতে জানে, সব রকম কুস্তি কস্‌রতেই সে সুদক্ষ। দারিদ্র্য-ভার পীড়িত হয়েও তার মেজাজী মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি। স্ত্রী বিভা এ সম্বন্ধে তাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ইতিমধ্যে সংসারে পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম ছেলের পর জন্মেছে আরও দু'টি কন্যা।

স্থানীয় স্কুলে অবিনাশ মাষ্টারী করে। স্কুলটি তারই পিতামহ বলরাম চৌধুরীর স্থাপিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তার ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন গ্রামের নূতন জমিদার হরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। বলা বাহুল্য, ইনি স্বর্গীয় যদুনাথ চৌধুরীর বিশ্বস্ত খাজাঞ্চী স্বর্গীয় রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর প্রপৌত্র। দেবীপুরের সমস্ত জমিদারী ইনিই কিনে নিয়েছেন এবং অবনীশ চৌধুরীর পুত্র অবিনাশ চৌধুরীকে অন্নাভাবে কষ্ট পেতে দেখে, করুণা পরবশ হয়ে স্থানীয় স্কুলে কুড়ি টাকা বেতনে একটা মাষ্টারী দিয়েছেন।

অবিনাশ কিন্তু সে সব গ্রাহ্যই করে না। সাংসারিক কোন প্রয়োজনই তাকে দিয়ে সাধিত হয় না। মাস গেলে কুড়িটা টাকা সে বিভার হাতে তুলে দিয়ে সারাটা মাস গান-বাজনা, তাস-পাশা, থিয়েটার নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়।

শীতের সকাল। অবিনাশ মুখ-হাত ধুয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসেছে। এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে এসে রৌদ্রে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণকে বিদেশী দেখে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবেন?

—আমি যাব বাবা জমীদার বলরাম চৌধুরীর বাড়ী। শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবা।

—বলরাম চৌধুরীর বাড়ী! একটা আকস্মিক আনন্দ বেদনায় অবিনাশের সমস্ত অন্তর দুলে উঠল। বলরাম চৌধুরীর নামে আজও আসে প্রার্থীর দল সাহায্য ভিক্ষা করতে! এত বড় সম্ভ্রম আর সুনাম কোন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে আজ! মাত্র তিন পুরুষ……মাত্র তিন পুরুষের ব্যবধানে প্রাসাদ থেকে আজ নেমে এসেছে পথের ধূলায়। প্রার্থী এসেছে গ্রামে তারই পিতামহের দয়ার দুয়ারে হাত পাততে,—আর বলরাম চৌধুরীর পৌত্র অবিনাশ চৌধুরী চুপ করে স্থানুর মত সেদিকে চেয়ে বসে আছে। আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে এও আজ সম্ভব হল। দূরে ধ্বংসোন্মুখ পরিত্যক্ত জমিদার ভবনের উচ্চ চূড়ার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে অবিনাশ বলল—বসুন।

—না, আমি বসব না বাবা। তুমি শুধু আমাকে বলরাম চৌধুরীর বাড়ীর রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। অনেক দূরে থেকে এসেছি বাবা।

—তাঁরা কেউ নেই। মরিয়ার মত অবিনাশ উচ্চারণ করল।—নেই! ব্রাহ্মণ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন।—কোথায় গেছেন তাঁরা?—মারা

গেছেন।—গত হয়েছেন? ও।—তা' তার বংশধর?—বংশধর নেই। তিনি নিবংশ হয়ে মরেছেন।

—হায় হায়, এমন পুণ্যশ্লোকের বংশও পৃথিবী থেকে লোপ পায়? একেই বলে কলিকাল। সৎ কাজের যা'দের অন্ত নেই—কোন মহাপাপে তাঁ'দের এ দশা হল কে জানে! নারায়ণ! ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগলেন।

—শুনুন। অবিনাশ ডাকল।

—বল বাবা।

—আপনি একটু বসুন—আমি আসছি এখুনি। এই বলে অবিনাশ দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল। জমিদার যদুনাথ-বলরাম আর অবনীশের রক্তধারা আজ তার দেহের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে। দেবীপুরের চৌধুরী বাড়ীতে প্রার্থনা নিয়ে এসে কোনো প্রার্থীই আজ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হয়নি, শুধু কি এই ব্রাহ্মণই ফিরে যাবে শূন্য হাতে? তা হয় না, চৌধুরী বংশের অবিনাশ চৌধুরী এখনও বেঁচে আছে। তা হয় না, ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পিতৃপুরুষের হ'য়ে সেই আজ পূরণ করবে।

বিভা তখন রান্নাঘরে স্বামীর জন্য চা আর ছেলে মেয়েদের জন্য দুধ জ্বাল দেবার ব্যবস্থা করছিল। সে না দেখতে পায়—অবিনাশ এমন ভাবে ঘরে ঢুকে তার পিতামহের আমলের একখানি জীর্ণ শাল বাক্স থেকে টেনে বের করে আনলো। তারপর নিজের আলোয়ানের তলায় লুকিয়ে শালখানিকে বাইরে নিয়ে এসে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বললো—এই নিন।

—তুমি দিচ্ছ কেন বাবা? ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন।—হ্যাঁ। আমাকেই দিতে হবে—আপনি বুঝবেন না, মানে আমারই দেওয়া উচিত। আপনি ব্রাহ্মণ, শীতে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনাকে দেব না তো কাকে দেবো? নিয়ে যান।

—-বেঁচে থাক বাবা। ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক। আরও কতকগুলি আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করতে করতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দিত মুখে প্রস্থান করলেন। তাঁর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনেই অবিনাশ বলল—যদুনাথ নাকি শীত নিবারণের জন্ত শেয়ালকে শাল দিয়েছিলেন, আর আজ আমি দিলাম মানুষকে। জমিদার যদুনাথের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে দানটা খুব মন্দ হয়নি কিন্তু। অবিনাশ হাসতে লাগল। কিন্তু সে-হাসি দেখলে কান্না পায়।

পাড়ার ক্লাবে চন্দ্রগুপ্ত রিহার্সাল দিয়ে অবিনাশ যখন বাড়ী ফিরল, রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। 'চন্দ্রগুপ্তে' অবিনাশের চন্দ্রগুপ্তেরই ভূমিকা। কারণ তার মত অমন লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারা গ্রামে নাকি আর একটিও নেই। অতএব রাজার ছেলে তাকে যেমন মানাবে এমন আর কাউকে নয়।

শীতকালের রাত্রি এগারটা, গভীর রাত্রি। বাড়ী ফিরে অবিনাশ দেখলো রান্নাঘরের দাওয়ার সামনে এক হাঁড়ি আগুন নিয়ে বিভা চুপ ক'রে বসে আছে। অনেক রাত্রি হ'য়ে যাওয়ার জন্য মনে মনে অবিনাশ একটু লজ্জিত হ'ল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না ক'রে মুখে বিভাকে বলল—তুমি শুধু শুধু জেগে আছ কেন বিভা?

—তোমাকে খেতে দিতে হবে না? মৃদু স্বরে বিভা বলল।

—আমাকে খেতে দেবার জন্য রোজ রোজ এ রকম রাত্তির জাগা ঠিক নয়। হঠাৎ যদি একটা অসুখ বিসুখ—। আমার ভাতগুলো ঘরের মধ্যে ঢাকা দিয়ে রেখো—আমি খেয়ে নেব।

—তা হয় না। খাবে চল।

খাওয়া দাওয়ার পর অনিবাশ শোবার ঘরে এসে দেখল তিনটি ছেলে মেয়ে মেঝের বিছানাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। পাশেই তাদের মায়ের ঘুমাবার জায়গা। খাটে পাঁচজনের স্থান হবে না বলে বিভা এই ব্যবস্থা করেছে। খাটে একলা অবিনাশ শোয়, আর নীচে ছেলেপিলে নিয়ে বিভা। হঠাৎ অবিনাশের চোখে পড়ল, একখানি মাত্র জীর্ণ লেপ ওরা চারজনে টানাটানি করছে, এবং তিনটে ছেলে-মেয়েকে পূরো ঢাকা দেবার পর বিভার জন্য অবশিষ্ট একটুও থাকে না। অবিনাশের মন খারাপ হয়ে গেল।

—আর লেপ নেই নাকি?—না। —কালই তাহ'লে লেপ একটা তৈরী করতে হয়। —আচ্ছা। সামান্য একটু ম্লান হেসে বিভা জবাব দিল।—হাসলে যে?—এমনি।—না, বলতে হবে। হাসলে কেন বল? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?—না। আবার বিভা ম্লান হেসে বললো।—কিন্তু তোমার মত পাগল আমি আর দুটি দেখিনি। দু-বেলা খেতেই আমাদের কষ্ট হয়, আর তুমি কিনা সেই পয়সায় লেপ তৈরী করাতে চাও। নাও, এখন শুয়ে পড় আলো নিভিয়ে দিয়ে। আর তা' ছাড়া শীত তো গেল বলে! এখন নূতন ক'রে লেপ তৈরি ক'রে মিছামিছি পয়সা নষ্ট করে লাভ কি? এতেই এ কটা দিন চালিয়ে নেব। তুমি ঘুমোও।

আলো নিবিয়ে দিয়ে অবিনাশ শুয়ে পড়ল। একটা কথা বিভা ঠিক বলেছে, শীত চিরকাল থাকে না। কিছুই চিরকাল থাকে না। যদু-নাথ চিরকাল থাকেন নি, বলরাম—অবনীশ চিরকাল থাকেন নি, অবিনাশও চিরকাল থাকবে না। সব হ'য়ে যাবে মিথ্যে, সব হ'য়ে যাবে গল্প কথা।

একখানা লেপ তৈরী করাবার তার পয়সা নেই—আর তারই পিতা-পিতামহ লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনি-মিনি খেলেছেন এ গ্রামেরই বুকের উপর। কে বিশ্বাস করবে এই আরব্য-উপন্যাস? দু' পুরুষের অপব্যয়ের এই অপূর্ব্ব পরিণাম স্বচক্ষে দেখলেও তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

আশ্চর্য্য সহনশীলতা বটে বিভার। এত বড় দারিদ্র্যের গুরুভার সে যেন বসুন্ধরার মত বুক পেতে বহন করছে। মুখে একটী কথা নেই, অভাবে অভিযোগ নেই, অনাহারে নেই কান্না। বিভা হচ্ছে অবিনাশের সংসারের হৃৎপিণ্ড। বিভা চলছে, তাই অবিনাশ চলছে। বিভা আছে তাই অবিনাশের ছেলে-পুলে আছে।

দারিদ্র্যের কথা ভুলে গিয়ে বিভার কথাই অবিনাশ ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে বিভার প্রতি একটা পরম মমতায় তার মন ভরে উঠল। অনেক দিন পরে আজকে ইচ্ছা হল বিভাকে একটু আদর করতে। আলো জ্বেলে অবিনাশ বিছানায় উঠে বসলো। বিভার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল—তার গায়ে একটুও লেপ নেই, অথচ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছে,—মুখে ফুটে উঠেছে একটি পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি। দারিদ্র্য-লক্ষ্মীর কাছে শীতের তীব্রতাও হার মেনেছে।

অবিনাশ ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে আলনা থেকে নিজের আলোয়ান খানা নিয়ে দু-ভাঁজ করে পরম যত্নে সন্তর্পণে বিভার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল।

কিন্তু প্রত্যেক দিন রাত ক'রে রিহার্স্যাল দিয়ে বাড়ী ফেরা অবিনাশের সহ্য হ'লনা। একে তো সেই কন্‌কনে শীত। তার উপর গায়ে

থাকে না যথোপযুক্ত গরম জামা। অবিনাশ অসুখে পড়ল। সেদিন বাড়ী ফিরে অবিনাশ বিভাকে বললো—আমি কিছু খাব না বিভা। আমার বোধ হয় জ্বর হ'য়েছে।—জ্ব—র! এক মুহূর্তে বিভা যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। কপালে হাত দিয়ে স্বামীর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করল। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল—শুয়ে পড়, জ্বরই হয়েছে দেখছি।

অবিনাশ শয্যা গ্রহণ করলো। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে; মাথার যন্ত্রণাও খুব। গত দশ বৎসরের মধ্যে অবিনাশের মাথাটাও ধরেনি। তাই অসুখ যখন করেছে, এখন বেশী দিন না ভোগায়। তা' হলে ছেলে-মেয়েগুলো আর বিভা না খেয়ে মরবে।

বিভা ম্লান মুখে পাশের ঘরে গিয়ে বাক্স থেকে পাঁচটা পয়সা বের করে স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে নিয়ে, সেটা লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিল। তারপর হাত দুটী জোড় করে মনে মনে বললো—মা, জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করিনি। আমার স্বামীর জ্বর ভাল করে দাও! তোমাকে পূজো ক'রে আমরা অনাহারে শুকিয়ে মরব, এ যেন না হয় মা!—মাগো দয়া কর! টপ্ টপ্ ক'রে বিভার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিন্তু দেবীর দয়া সহজে হয় না। চোখের জলের প্রতি দয়া করতে গেলে তাঁর সৃষ্টির কাজ চলে না। তা'ছাড়া এসব তুচ্ছ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করবার তাঁর সময় নেই। কত রাজা, কত মহারাজা, কত নবাব, আমীর ওমরাহ, কত হিটলার, কত মুসোলিনীকে তাঁর দয়া করতে হয়। দেবীপুরের নগণ্য অবিনাশ চোধুরীর স্ত্রী নগণ্যতমা বিভা চৌধুরীকে দয়া করতে হলে দেবীর আভিজাত্য নষ্ট হবে যে!

তাই দেবীর দয়া হ'ল না। তিনদিনের মধ্যে অবিনাশের অসুখ বাঁকা পথ ধরল। বিকারের ঘোরে অবিনাশ ক্রমাগত পাইক ডাকতে লাগল,

বরকন্দাজ ডাকতে লাগল, নায়েব, গোমস্তা, খাজাঞ্চী প্রভৃতিকে তিরস্কার করতে লাগল। তিন চারটে মৌজার খাজনা মাপ করে দিল—তার রাজ্যে যত দরিদ্র ভিক্ষুক আছে সবাইকে এক একখানা ক'রে লেপ তৈরি ক'রে দিতে হুকুম দিল। প্রত্যেককে শাসাতে লাগলো,—খবরদার খালি গায়ে কেউ শোবে না! ডাক্তার এসে বললে—ডবল নিউমোনিয়া। সুদীর্ঘ দেড় মাস পরের ইতিহাস। এই দেড় মাসের ইতিহাসে কোন নতুন কথা নেই। কেবল মৃত্যু-দেবতার সঙ্গে মর্ত্ত্য-মানবীর কঠোর সংগ্রাম। রাত্রি জাগরণ, দারিদ্র্য, অনশন, ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার কাহিনী। অবশেষে বিধাতার পরাভব ঘটল। বিভার ঐকান্তিকতার কাছে হয়ত লজ্জিত হ'য়েই তিনি এ যাত্রা অবিনাশকে নিস্কৃতি দিলেন। অবিনাশের জ্বর ছাড়লো। জীবনের আলো ধীরে ধীরে তার মুখের উপর ফুটে উঠলো। প্রথমেই দেখলো একটী মেয়ে দু'খানি ব্যাকুল চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে বসে আছে। অবিনাশ তাকে চিনতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

—আমি বিভা। উত্তর এল।

বিভা! নামটা যেন পূর্ব্ব-জন্মের পার থেকে তার স্মৃতির দুয়ারে এসে ধাক্কা মারল। সেই বিভা—আজ এই হ'য়েছে? মলিন, শীর্ণ, ক্লান্ত! প্রচণ্ড ঝড় খাওয়া বনস্পতির মত আলুথালু, ছন্দহীন, শিথিল-বৃন্ত! চোখের নীচে পড়েছে গভীর কালিমা রেখা। গালের হাড় দুটি সুস্পষ্ট হ'য়ে জেগে উঠেছে, চুলগুলি রুক্ষ। সেই বিভা!

—আমি তাহ'লে বেঁচে উঠলাম বিভা? চোখ বুঁজে ক্লান্ত কণ্ঠে অবিনাশ উচ্চারণ করল।

—হ্যাঁ, ভগবান আমার মুখ রেখেছেন। এই বলে বিভা হাত যোড়

ক'রে উপরের দিকে চেয়ে নমস্কার করলো। দেখা গেল, তার কোটর গত চোখ দুটির কোল বেয়ে শীর্ণ দু'টি জলের ধারা গালের উপর দিয়ে বুকের দিকে নামছে।

আজ অবিনাশের অন্নপথ্য। সে এরই মধ্যে অনেকটা সেরে উঠেছে। আস্তে আস্তে দু' এক পা হাঁটতেও পারে। ডাক্তার আজ বলে গেছেন ভাত দিতে।

বেলা দশটার সময় পরিপাটী ক'রে একখানি কলার পাতায় ভাত বেড়ে, ভাতের মাঝখানে গর্ত্ত ক'রে একটুখানি মাগুর মাছ আর কাঁচা কলার ঝোল ঢেলে দিয়ে, বিভা স্বামীকে ধরে নিয়ে এসে আসনে বসিয়ে দিলো। কলার পাতায় ভাত দিতে দেখে এতদিন পরে অবিনাশ যেন পূর্ণ চৈতন্য ফিরে পেল। খেতে বসে আজ সে প্রথম বিভার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। পরণে একটা তালি দেওয়া শত ছিন্ন ময়লা কাপড়, দুহাতে দু'গাছি শাঁখা, মাথায় জলজল করছে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথের সিঁদুর আজ আরও বেশী চওড়া ক'রে দেওয়ায় অনেকদিন পরে আজ যেন বিভাকে নতুন ক'রে দেখলো। সে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে দেখে বিভা বললো—

—যাও! হাঁ ক'রে দেখ্‌ছো কী?

—তোমাকে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়। আজ আমার মনে হচ্ছে বিভা, আমি যেন এর আগে তোমাকে দেখিনি। যেন—

—হয়েছে, হয়েছে, এখন খেয়ে নাও। বলতে বলতে বিভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে হয় চোখের জল গোপন করবার জন্যই এই প্রয়াস।

হঠাৎ অবিনাশের মনে হ'ল—সে অজর অমর, সে অবিনশ্বর, যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে তাকে ফিরিয়ে এনেছে—সে সাবিত্রী…সে…
হঠাৎ হো হো ক'রে নিজের মনেই হেসে উঠলো অবিনাশ। কী রকম যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য হাসি। ভাগ্যিস্, সে হাসি বিভা দেখতে পায়নি, নইলে স্বামীর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সন্দেহ হতো…

কিন্তু বিধাতা যে ভাগ্যের সঙ্গে রসিকতা করতে আরম্ভ করেন,—তার ওঠা-নামার কথা স্বয়ং বিধাতাই বলতে পারেন না। মাসখানেক যেতেই বিভা বুঝলো যে স্বামীর মাথার গোলমাল সুরু হ'য়েছে। স্কুলে যায়। ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে হঠাৎ এক সময় নিজেই চেঁচিয়ে ওঠে, কখনো কখনো বা হো-হো ক'রে হেসে ওঠে হঠাৎ। ছাত্রের দল ভীত মুখে চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে থাকে তাদের প্রিয় মাষ্টার মশায়ের দিকে,—সম্বিৎ ফিরে আসে অবিনাশের। বলে—"কেমন প্লে করলাম বল্ দিকিনি!" কিন্তু মুখে এ কথা বললেও, মনে মনে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে অবিনাশ। মনে হয়, সে পাগল হ'য়ে যাচ্ছে নাকি? যদি সত্যি একদিন ভোর বেলায় উঠে দেখা যায় যে, সে পাগল হ'য়ে গেছে, তাহ'লে? তখন? কী করবে বিভা—এই ছেলে-পুলে আর সংসার নিয়ে?
একদিন দুদিন করতে করতে কাটে আরও দু'মাস। যে মুহূর্ত্তের উন্মত্ততা মাঝে মাঝে এসে তাকে আক্রমণ করতো, সেটি দীর্ঘ স্থায়ী হতে লাগলো। এই সময়ে একদিন স্কুলের হেড্মাষ্টার নিশিকান্ত বাবু অবিনাশকে আফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ ভনিতা ক'রে বললেন—
—বুঝতেই পারছেন ছোট ইস্কুল। প্রত্যেককে ঠিক ঠিক মাইনে দেবার সঙ্গতি স্কুলের নেই। তাই বলরাম মেমোরিয়াল ইস্কুলের কমিটি ঠিক

করেছেন দু' চারজন মাষ্টার কমাতে হবে। নইলে ইস্কুল উঠে যাবে। তাই—

চোখের পলকে অবিনাশের মাথার সেই অবস্থা ফিরে এল। সে হাসতে হাসতে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে গেল। নিশিকান্ত বাবু এই অবস্থার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—অবিনাশ বাবু ! আপনি আমাকে অপমান করতে পারেন না। কখনই পারেন না। কার কথা কে শোনে ? হাসির ধমক গিয়ে থামলো বিভার কাছে।

সব কথা শুনে বিভা কাঁদতে লাগলো। তার যখন বিয়ে হয়, বেশ মনে আছে তার,—সকলেই বলেছিল—বিভা রাজরাণী হলো। জমিদার বলরাম চৌধুরীর পৌত্র ? ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌ ! তারা যে টাকার কুমীর গো ! বিভাও তো তাই দেখেছে বিয়ে হ'য়ে এসে। বিয়ের প্রথম বছরে বিভাও তো দেখেছে অন্নপূর্ণা পূজায় কাঙালী সমেত চার পাঁচ হাজার লোক খেতে ! কোথায় কোন্ ফুস্‌মন্তরে মিলিয়ে গেল সেই রাজ-ঐশ্বর্য্য !

বোবার মত চেয়ে রইল অবিনাশ,—তার ক্রন্দসী স্ত্রীর দিকে। সে যে কখন হাসতে আরম্ভ করেছে তাই তার মনে নেই। কোন কারণ ছিলনা হাসবার। অন্ততঃ আর কিছু না হোক্,—মাইনেটা আদায় হতো ! হয় তো—চাই কি দু' এক মাসের বেশী মাইনেও পাওয়া যেতে পারতো। বোবায় ধরা ঘুমন্ত মানুষের মতো একটা নিরুপায় আত্মানুশোচনা তাকে দিবারাত্র পীড়ন করতে লাগলো……

বর্ষাকাল।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টির বিরাম নেই। সকালে উঠেই বিভা বলেছিল —আজ কিন্তু ঘরে কিছু নেই। কিন্তু সে কথা বলা না বলা দুই-ই সমান। কারণ বিভা নিজেই জানতো যে গ্রামে গিয়ে কারুর কাছে চাইলেও তারা কিছু দেবে না অবিনাশকে। মজা দেখছে সবাই। এত বড় ধনী, এত বড় জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী তার স্বামী। তারা বোধ হয় চায়, যে তার স্বামী দোরে দোরে ভিক্ষা করুক। কিন্তু তা' সে কিছুতেই হ'তে দেবে না। বিভা বেঁচে থেকে চোখ চেয়ে দেখবে তার স্বামী করছে ভিক্ষে!

বেলা বাড়তে লাগলো। ছেলে মেয়ে দু' একবার মাকে বলবার চেষ্টা করলো যে খিদে পেয়েছে। বিভা সস্নেহে তাদের কাছে টেনে নিয়ে মিষ্টি গলায় বললো—

—আজ আমাদের কিছু খেতে নেই বাবা। আজ—আমাদের আজ যে চতুর্দ্দশী—আজ উপোস।

—উপোস কেন মা?

—উপোস—মানে—কাল্‌কে যে আমাদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজো। কালকে রাত্তিরে। পূর্ণিমা যে! তাই নিয়ম হচ্ছে আগের দিন কিছু খেতে নেই।

—সব্‌বাইকে?

—সব্বাইকে।

—আজ্‌কে রাত্তিরেও কিছু খেতে নেই মা?

—হ্যাঁ রাত্তিরে তোমাদের খেতে আছে। বাবার আর আমার বারণ।

বেলা গড়িয়ে চললো অপরাহ্নের দিকে। কিন্তু বৃষ্টির কামাই নেই। হু হু ক'রে বইছে পূবে হাওয়া। আকাশে মেঘের দাপাদাপি। দিন

থাকতে থাকতেই অন্ধকার হ'য়ে এল। ঘরের কোণে রক্ষিত হাঁড়ির তলায় অল্প চারটি চিঁড়ে পড়েছিল, সেই ক'টি কুড়িয়ে এনে ভিজিয়ে ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে দিল বিভা। সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লো। উপবাস-জীর্ণ দেহ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দাওয়ায় এসে বসলো। শেয়াল ডাকছে···দিনান্ত ঘোষিত হ'লো।

—জানো বিভা! জমীদার যদুনাথ একবার শেয়ালদের শাল দিয়েছিলেন।

—মানুষকে দেননি বলেই আজ এই দুর্দ্দশা আমাদের। যা দিয়েছিলেন সব শেয়াল কুকুরকে।

—তাই বটে। ম্লান হেসে জবাব দিল অবিনাশ। কিন্তু আজ ব'লেই তো কথা নয়, কাল সকালে কী হবে? কী হবে পরশু? সারা জীবন কী হবে? এই কথা নিজের মনেই যেন বললো অবিনাশ।—বারে জীবন! পয়সা নেই, কড়ি নেই, গয়না-গাঁটি নেই, এমনকি কাঁসার থালা-বাটিগুলো অবধি বাঁধা পড়েছে, না বিভা?

—পড়ুকগে! দ্যাখো, একটা কথা আজ আমার সকাল থেকে কেবলই মনে হচ্ছে। দুঃখের শেষ সীমায় এ'সে পড়েছি আমরা। এবার বোধ হয় সুদিন আসছে।

—আসবে কোন্ পথে বিভা? লেখাপড়া জানিনে ভাল রকম। গায়ে নেই বল, বুকে নেই জীবনীশক্তি। একখানার বেশী দু'খানা পরণের কাপড় নেই তোমার। সুদিন আসবে কোন্ পথে বিভা?

—তা জানিনে। বিভা গলায় জোর দিয়ে বললো। তবে কালকে স্বপ্ন দেখে আজ আমি তোমার ঠাকুরদার বাবার ছবিখানা বার ক'রেছি—মাথার কাছে রেখেছি। কী জানি, আমার মন বলছে—রাত্রির অন্ধকার যখন এত কালো, তখন ভোরের আলো দেখা দিলো বলে।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এলো। বারান্দায় বসে থাকা আর সম্ভব নয়। দুজনে উঠে গিয়ে ঘরে বসলো। অন্ধকার ঘর। তেল কেনার পয়সা নেই বলে আলো জ্বলেনি। বিভা গিয়ে শুয়ে পড়লো ছেলে-মেয়েদের পাশে, অবিনাশ গিয়ে শুলো বিছানায়। ঠক্ ক'রে মাথায় কী একটা পড়লো। হাত দিয়ে অনুভব করলো—কী একটা ফোটো। মনে পড়লো জমীদার যদুনাথের ছবি। কেন জানা নেই, ছবিটাকে দু'হাতে বুকে চেপে ধরতেই হু হু ক'রে নিঃশব্দে কেঁদে উঠলো অবিনাশ। অসুখ থেকে উঠে তার মনে হয়েছিল—সে অজয়, অমর, অবিনশ্বর। কিন্তু আজ সে প্রার্থনা ক'রছে—মৃত্যুর। সকলকার এক সঙ্গে। কেউ যেন বেঁচে না থাকে—শোক ভোগ করবার জন্য।...ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো অবিনাশ।

আলো...আলো...নীল রংয়ের একটা অদ্ভুত আলোতে ঘর উদ্ভাসিত। বিছানার উপর উঠে বসলো অবিনাশ। ভোর হ'য়ে গেছে নাকি? নাঃ, তাতো নয়! হঠাৎ দেখলো—তার ঠিক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এক সৌম্য-দর্শন প্রৌঢ়। তিনি স্থির চোখে চেয়ে আছেন তার দিকে। দুর্ দুর্ ক'রে উঠলো অবিনাশের বুক। সে কম্পিত গলায় বললো—কে তুমি—আপনি?

—আমি জমীদার বলরাম চৌধুরী। তোমার পিতামহ। সন্ত্রস্ত অবিনাশ তাঁকে প্রণাম করবার জন্য নামবার চেষ্টা করতেই তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—

—আমাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা কোরো না অবিনাশ। আমি তোমার চোখের জলে আকৃষ্ট হ'য়ে নেমে এসেছি।

—আমাকে ভিক্ষুক ক'রে জগতে পরিচিত করবার জন্যই কি জমিদারী শাসন ক'রেছিলেন দাদু ? এই দেখুন ! আমার পরণে কাপড় নেই, আজ সকাল থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী উপোস ক'রে আছি। আমার চাকরীটা গেছে। আমি—

—কী চাও তুমি ?

—টাকা—টাকা।

—এসো আমার সঙ্গে।

এই বলে বলরাম চৌধুরী চললেন দরজার দিকে। অভিভূত অবিনাশ চললো তাঁর পেছনে পেছনে। অঝোর ঝরণ বৃষ্টি মাথায় পড়ছে। চলেছে দুজনে। সঙ্গে চলেছে দাদুর গা থেকে বেরোনো সেই নীল আলো।

পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ীর ত্রিসীমানায় কেউ আসে না। গ্রামে গুজব এক জোড়া বাঘ আর বাঘিনী মাঝে মাঝে এসে বাস করে সেখানে। সিংহ দরজার গভীর জঙ্গল ভেদ ক'রে এগোলেন বলরাম, পেছনে অবিনাশ।

জীবনে কোন দিন আসেনি অবিনাশ এখানে। বহু ঘরের ছাদ ভেঙে পড়েছে, শ্যাওলাধরা মেঝে···ব্যাংয়ের ডাকের সঙ্গে চারদিক থেকে এক ধরণের বিকট আওয়াজ উঠছে।···এইটেই বোধ হয় অন্দর। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলো সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। একদল চামচিকে সেই নীল আলোতে চক্রাকারে ঘুরতে সুরু করলো। নামতে নামতে এক সময় দেখলো অবিনাশ—একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

—বংকিম ! ঘর কেঁপে উঠলো বলরামের ডাকে।

—হুজুর ! বলতে বলতে একটি কৃশকায় বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল সামনে।

—সিন্দুকটা খোল্ !

ম্যাজিক দেখছে অবিনাশ। হঠাৎ তার চোখের সামনে সেই স্যাঁৎসেতে নোনাধরা দেয়াল সরে গিয়ে দেখা দিল একটি প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক। চাবি লাগিয়ে টানলো বংকিম, দেখতে দেখতে ভীষণ শব্দে সিন্দুকের ডালা খুলে গেল। এগিয়ে গেলেন বলরাম চৌধুরী। বললেন—

—ভোর হ'য়ে আসছে অবিনাশ, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবো না। এই সিন্দুকের মধ্যে ত্রিশ হাজার মোহর আছে। আর এই পাশে রয়েছে বাহাদুরপুর পরগণার সমস্ত দলিলপত্র। এই পরগণা তোমার। এই কাগজপত্র পায়নি বলে এই পরগণা দখল করতে পারেনি খাজাঞ্চি। দুটো ছোট বাক্সে পাঁচ হাজার ক'রে মোহর আছে। একটা তুমি নিয়ে যাও। চাবীটা নাও। প্রয়োজন মতো এই সিন্দুক খুলে তোমার জিনিষ তুমি নিয়ে যেও।…ছেলেপুলে নিয়ে সুখী হও অবিনাশ। চৌধুরী বংশ বাঁচুক।…এই বলে চাবী দিলেন তার হাতে। বললেন—জায়গাটা মনে থাকবে ?

—হ্যাঁ।

—এইটে ছিল গোপন কোষাগার। কেউ জানে না এর খবর। তোমার ঠাকুরমার শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে পথ।

প্রচণ্ড ভারী বাক্স…চাবীটাও মস্ত বড়ো। দুর্ব্বল দেহে কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী ফিরে এসে—চাবী রাখলো বালিশের তলায় আর বাক্সটা রাখলো খাটের নীচে। এখন আর বিভাকে ডেকে কোন লাভ নেই। ভীষণ ক্লান্ত। সকালে উঠে যা হয় করা যাবে।

—একি। ওঠ, ওঠ! বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে সব! ভাঙা ঘর…।

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলো অবিনাশ। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল বিভার মুখের দিকে। পাগলের মতো বালিশ তুললো—হ্যাঁ, চাবি রয়েছে। লাফ দিয়ে নীচে নেমে খাটের তলা থেকে বাক্স টেনে বার করলো। চীৎকার ক'রে উঠলো—মোহর! বিভা! মোহর পেয়েছি। কালকে রাত্রে বলরাম চৌধুরী এসে দিয়ে গেছেন। এই দেখ! সত্যিই বাক্সের মধ্যে মোহর! হঠাৎ চোখে পড়লো বালিশের পাশে একখানি কাগজ। তাতে লেখা—

দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়ে বৃষ্টির জন্য পুরোনো প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কৌতুহল বশে খুঁজতে খুঁজতে এই মোহরের খোঁজ পাই। যখের ধন হ'লে আমার ক্ষতি হবে ভেবে, এর অর্দ্ধেক আপনাকে দিয়ে গেলাম। সিন্দুকের চাবীও রেখে গেলাম। বলরাম চৌধুরীর শোবার ঘরের যে দেওয়াল এই বৃষ্টিতে ধ্বসে পড়েছে,—তার মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামলে নীচে ঘর। সিন্দুকে ত্রিশ হাজার মোহর ছিল, পনেরো আমি নিয়ে গেলাম, আপনার পনেরোর মধ্যে পাঁচ দিয়ে গেলাম, চাবিও দিয়ে গেলাম, আরও দশ নিয়ে আসবেন। আর একটা কথা, সিন্দুকে কতকগুলি মূল্যবান দলিল দেখলাম,—নিয়ে আসবেন। আপনি দরিদ্র হ'লেও ধার্ম্মিক, তাই মা কালী আমার হাত দিয়ে এগুলি আপনাকে পাঠিয়েছেন। ইতি

একজন ডাকাত

হু হু' ক'রে কেঁদে উঠে বিভা স্বামীর বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এক বছর পরে……

জমিদার অবিনাশ চৌধুরী ফিরে এসেছে তার পূর্ব্ব পুরুষের প্রাসাদে। ঝক্ ঝক্ করছে চৌধুরী মঞ্জিল…। নূতন ক'রে অন্নসত্র খোলা হ'য়েছে। ছেলে মেয়েরা গাড়ীতে চেপে হাওয়া খেতে যায়। লোকে বলে—প্রচুর গুপ্তধন উদ্ধার করেছে অবিনাশ—প্রাসাদের নানা জায়গা থেকে।… বিভার ইচ্ছে থাকলেও দাস-দাসীরা তাকে কাজ করতে দেয় না। তা'-ছাড়া তার শরীরও ভাল নেই। আসন্ন প্রসবার শরীর কখনোই ভাল থাকে না।

বাহাদুরপুর পরগণার পুণ্যাহ উৎসব সেরে বাড়ীতে ঢোকবার মুখে থমকে দাঁড়াল—অবিনাশ। চৌধুরী-মঞ্জিলের মাথায় নিশান উড়ছে। সেই দিকে চেয়ে অবিনাশের অকারণেই মনে হ'ল—চৌধুরী মঞ্জিল অজর নয়, চৌধুরী বংশও অমর নয়—কিন্তু অবিনাশ অবিনশ্বর…

অস্থাবর

গিরীশ মিস্ত্রীর মেয়ে সুরধুনীর বরাতটা গোড়ায় ছিল নিতান্ত গোলমেলে। নইলে রং কালো হ'লেও অমন অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর অধিকারিণী যে, তাকে সবাইকার এত হোঁচট্ খেতে হল কেন? গিরীশ মিস্ত্রী জাতিতে সূত্রধর, অর্থাৎ ছুতোর। মানুষটা ছিল সে একটু রগ চটা। একটুকরো কারখানা—মফঃস্বল টাউনের ধূলোভরা পথের পাশে। প্রধানতঃ গরুর গাড়ীর চাকাই তৈরী করতে হয়। অবসর সময়ে ছেলেদের কিছু কিছু কাঠের খেলনা, চাকী বেলুন, ডালঘেঁাটা, ঠাকুরের সিংহাসনও তৈরী হয়। গিরীশের দুই ছেলে এক মেয়ে। কার্ত্তিক, গণেশ আর সুরধুনী। কার্ত্তিকের বয়স বাইশ, গণেশের কুড়ি আর তাদের চার বছরের ছোট সুরধুনী। গিরীশের স্ত্রী নিভাননী নিতান্ত ভালমানুষ।

রোগা রুক্ষ গিরীশ নাকের নীচে চশমা নামিয়ে হাতিয়ার নিয়ে কাজ করে। এক জোড়া চাকা বিক্রী হ'লেই দিন পনের ষোল সংসারে নিশ্চিন্ত। বাড়ীতে দুটি গরু আছে। প্রথম দুধটা ঠাকুর বাড়ীতে দিতে হয়, সকাল বেলা গিরীশ সেই তদারক করছিল। গরু দুইছিল কার্ত্তিক, কোলের বড় ঘটিটা প্রায় পূর্ণ হবে হবে—এমন সময় বাছুরটা কেমন ক'রে যেন টের পেয়ে গিয়ে চীৎকার করতেই সঙ্গে সঙ্গে গরুটা পা ছুঁড়তে সুরু করলো। গিরীশ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, এবার চটে গিয়ে বললো—

—আচ্ছা বেহুত্যা গরুতো ! চ্যাচ্ আছে ক্যানেরে কার্ত্তিক্য্যা ?

—বাচ্চার লেগ্য্যা। কার্ত্তিক বললো।

—ক্যানে ? বাচ্চা উয়ার কি পালিয়ে:যেছে ? লে ! লে হ'য়্যাছে ; উয়াই দিয়ে আয়ধিনি ঠাকুর বাড়ীতে।

—যেছি। বলে কার্ত্তিক ঘটি নিয়ে উঠে পড়লো।

সুরধুনী গিয়েছিল ঘাটে জল আনতে। কখনো কোন কাজ সে তাড়াতাড়ি করতে পারত না। ধীরে, সুস্থে, বিচার বিবেচনা ক'রে পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তবে সে একটা কাজ করে। সেদিনও তাই—হয়েছিল। মেয়ের বিয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে নিভাননী তাকে 'সোমবার' করতে উপদেশ দিয়েছিল। 'সোমবার' করা মানে হ'ল, প্রতি সোমবারে সারাদিন উপোস ক'রে থেকে সন্ধ্যার সময় মটর ডাল সেদ্ধ দিয়ে ভাতে ভাত খেতে হয়। এই কথা শুনে সুরধুনীর মাথায় বজ্রাঘাত হ'য়েছে। তাই আজ প্রথম জল আনতে যাবার পথে দেখা হ'ল বামুন মার সঙ্গে। বামুন মা দুনিয়ার সব জানেন—বিশেষ ক'রে শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার এবং বিধান। সকলকে সৎ উপদেশ দিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হননা। তবে একটা দোষ (অথবা গুণ) যে তাঁর পেটে কোন কথা থাকে না। ঘাটের পথে বামুন মাকে পেয়ে সুরধুনী জিগ্যেস করলো—

—হ্যাঁ বাম্হন্ মা ! সমবার করলে কী হয় ?

—ক্যানে ? কে বোল্য্যাছে সমবার করতে তোকে ?

—মা বুল্‌ছিল। সমবার করলে বিহা হয়, না—কী হয়, তাই। মাথাটা নীচু করলো সুরধুনী। বামুন মা কী যেন চিন্তা ক'রে নিলেন,—পরে বললেন—সম্‌বারের ভ্যাজাল্ তো কিছু নাই। দিন্‌ভোর উপ্যাস্

কোম্‌য়্যা—রাত্তিরে মটর ডাল সিদ্ধ আর ভাত খাবা। আলো চাল—গাওয়া ঘি দিয়্যা। উস্‌ন্যা খাবা না। উয়াতো হোছে মাহাদেবের ব্রেতো। কম্‌না ক্যানে!

অতএব সুরধুনী বেশ ভক্তি ক'রে 'সোমবার' করতে সুরু করলো, এবং গিরীশ মিস্ত্রীর বরাতেই হোক, সুরধুনীর কপালেই হোক, কি মহাদেবের হাত যশেই হোক, সুরধুনীর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল, এনাতুলীবাগের মতি মিস্ত্রীর সঙ্গে। কাণে দুটো দুল, গলায় এক গাছি হার আর হাতে দু'গাছি সোনা বাঁধানো শাঁখাতে সুরধুনীকে বিবাহের রাত্রে যে কী অপরূপ দেখতে হ'য়েছিল—সে বলবার নয়।

সুরধুনীর বর—মতি ছেলে ভাল। হাতীর দাঁতের কাজ করে। বাড়ীতেই বাইরের ছোট্ট ঘরখানিতে বসে বসে হাতীর দাঁত দিয়ে সে অজস্র জিনিষ তৈরী করে। খাগড়া থেকে লোক এসে পাইকারী হারে কিনে নিয়ে যায়। তা' সত্যি কথা বলতে গেলে, মতি মাসে দু'শো টাকা রোজগার করে। বাড়ীতে খাবার লোকের মধ্যে বুড়ো বাপ—মা, এক বিধবা বোন, আর তারা স্বামী-স্ত্রী। তবে সে যে একেবারে নির্ভেজাল মানুষ—তা' নয়। টাকা পয়সা হাতে থাকলে আর মেজাজ ভাল থাকলে. সে একটু আধটু মদ্যপান করে। ব্যস্! আর কিছু না।

দিন যায়……

স্বামীস্ত্রীর মনের মিল খুব। কেউ কারুকে না দেখে থাকতে পারে না। বেলা ৩টার পরে খাওয়া দাওয়া সেরে যখন মতি বাইরের ঘরে এসে বসতো কাজ করতে, তখন তার কাছ ঘেঁষে বসতো সুরধুনী, নিবিষ্ট মনে দেখতো স্বামীর কাজ। তারপর একটি একটি

ক'রে শিখতে শিখতে সেও একজন হাতীর দাঁতের ভাল কারিগর হ'য়ে দাঁড়ালো, এবং স্বামীকে লুকিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ছবি দেখে দেখে অবিকল সেই জিনিষটি তৈরী ক'রে ফেললো। যেদিন ভরসা ক'রে সে স্বামীকে দেখালো, সেদিন—মিনিট দু'য়েক হাঁ করে চেয়ে থেকে মতি দুম্ ক'রে স্ত্রীর পায়ের ধূলো নিয়ে বললো—বাপের ব্যাটা (ওরা অত জানেনা) বটে তুই ! কোর‍্য়াছিস্ কী ? ই কতিক্যার বাড়ী কতি এনে ফেল্‌লি ! হাত্তোর ভাল হোক্। …দিন সাতেক পরে খাগড়ার মহাজন ৩২৫৲ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেল—সুরধুনীর হাতে গড়া শিল্প-চাতুর্য্যের সেই অপূর্ব্ব নিদর্শনটি। মতি আনন্দের চোটে সে রাত্রে এমনই মদ খেলো যে দিন তিনেক আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না।

এই ফাঁকে সুরধুনী ভট্টপাড়ায় বাপের বাড়ী এলো। বাল্য সখী সুষমা জিগ্যেস করলো—কেমন আছিস্ সুরো ? চিন্তিত মুখে সুরধুনী বললো—ভালো আর কতিরে ভাই ? দাঁতের দর যে রকম বেড়্যা গিয়্যাছে—কাজ ফাজ্ আর চলবেনা। দু' ইঞ্চি দাঁতের একটা বালার খরচ কত পড়ে বোল্‌ধিনি ? বারোগণ্ডা তো বটেই—না কী ? আচ্ছা বেচ্‌বি কতো ? দেট্টা টাকা লে ! ক্যামুন ? তাহেলে ? দু' টাকায় যদি পাঁচটা টাকা না এলো, তেবে কী হ'ল ?…দাঁতই পাওয়া যেছেনা ! তা' ব্যবসা। ময়ুর ভঙ্গের দাঁতের দর হোচ্ছে তিন কুড়ি দু' আনা, তো আসামের দাঁতের দর লিবে চার কুড়ি তের আনা, আবার যদি উদ্দিক্‌ক্যার ল্যাও—

—সন্ধ্যা হয়ে গেল। বলে সুষমা পালিয়ে বাঁচলো।

চারদিন ছিল বাপের বাড়ীতে সুরধুনী। এই চারদিন তার মুখে অন্য কথা কেউ শোনেনি। খালি হাতীর দাঁত—আর দাঁত। কোন্ দাঁত

ভাল, কোন্ দাঁত মন্দ, কোনটা মাঝারী। কোন্ দাঁতে বালা আংটি ভাল হয়, কোন্টায় সিঁদুরের কৌটা, গয়নার বাক্স, কোন্ দাঁত কী ভাবে কাটতে হয়—ব্যাঁকা ক'রে, সোজা ক'রে এই সব শুনতে শুনতে গিরীশ একদিন ক্ষেপে গেল।

—তোর দাঁতের গুষ্টিকে বেচি। হাতীর দাঁতের ফুচুর্ ফুচুর্ কাজ—উয়ার মধ্যে পয়সার ফুট্আনি আছে—কিন্তু বাহার নাই। মাদীর কাজ। হ্যাঁ, বানাক্ পেহা, (গরুর গাড়ীর চাকা) তবে তো বুঝি !

—পেহা ছোটলোকে বানায়।

সুরধুনী রাগের চোটে কথাটা বলে ফেলে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল! ফেটে পড়লো গিরীশ।—লে, তোর কাপড় চুপড় লে! আজই তোকে উখানে রেখ্য়্যা আস্‌বো। পেহা বানায় ছোটলোকে! শুন্‌ছো গো কাত্তিক্য়্যার মা, পেহা বানায় ছোটলোকে।

—উ গিধ্নীকে আজই থুয়্যা এসো না ক্যানে! রান্নাঘর থেকে ক্রুদ্ধ জবাব এল নিভার।

সুরধুনী ভাগ্যবতী। শ্বশুর বাড়ী থেকে গঙ্গার জল আনতে যাবার পথে পড়ে একটি স্যাকরার দোকান। উপেন স্যাকরার যুবক পুত্র বিভু সেখানে আপন মনে কাজ করে, আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে স্নানার্থিনীদের রূপ দেখে। এক একদিন তার মন খারাপ হ'য়ে যায়। জীবন যৌবন মনে হয় বিস্বাদ। সোণারূপোর অলংকার গঠনে মন বসেনা তার। ঘর থেকে মোড়াটা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। দলে দলে লোক যায় গঙ্গা স্নান করতে। মন বলে—কেন এই সোণার খাঁচায় আছিস্ পড়ে? চলে যা এখান থেকে, উড়ে যা

অচেনা দেশে। হাতের কাজ জানিস্—খাওয়ার অভাব হবেনা। পালিয়ে যা!

এ হেন বিভু স্বর্ণকারের সেদিন সন্ধ্যায় চোখ পড়লো সুরধুনীর উপর। জল নিয়ে ঘরে ফিরছে পূর্ণ-যৌবনা সুরধুনী। সূর্য্য তখনো অস্ত যায়নি, লাল হ'য়ে গেছে পথ ঘাট। পিতলের কলসিটী কাঁখে—জলের ভারে ঈষৎ বেঁকেছে সুঠাম তনু দেহখানি। বিভুর যেন ভগবদ্দর্শন হলো। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল সুরধুনীর দিকে। ওকে সে চেনে। ওর ভাই গণেশ তার ক্লাশ্ ফ্রেণ্ড। সেই সূত্রে সে অনেকবার সুরধুনীর বাড়ীতে গেছে গণেশকে ডাকতে। প্রাইমারী পরীক্ষা দেবার পর সে আর গণেশ একই সঙ্গে লেখাপড়া ছাড়ে। দুজনের বাপ দুজনকে টেনে নেয় আপন আপন জাত ব্যবসায়। সুরধুনীকে সে সময় সে দেখেছে—এক আধদিন নয়, রোজ। কিন্তু সে সুরধুনী ছিল কালো, রোগা, নাক দিয়ে সর্দ্দি পড়্ছে গড়িয়ে। কিন্তু আজ এ কোন সুরধুনীকে দেখছে বিভু? কলসী কাঁখে লীলায়িত লাস্যে পুরুষের রক্তে দোলা জাগিয়ে এই যে যাচ্ছে মেয়েটি—এ কে? সুরধুনী? গণেশ মিস্ত্রীর বোন? ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে রইল বিভু। অঙ্গে অঙ্গে দুরন্ত যৌবন কোন্ মধুরের প্রত্যাশায় স্থির হ'য়ে আছে? যেমন সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ অকথিত আনন্দের শিহরণে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিশ্চল হ'য়ে গিয়ে পর্ব্বত নাম নেয়।···এ মেয়ে যদি দু' বেলা তার দরজার সুমুখ দিয়ে বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ বাড়িয়ে গঙ্গায় জল আনতে যায়—তবে কী করলো বিভু এতকাল পর-স্ত্রীর গলার হার আর হাতের চুড়ী বানিয়ে?···সুরধুনী চোখের পলকে থম্কে দাঁড়াল বিভুকে বারান্দায় বসা দেখে। তারপর মৃদু একটু হেসে গানের মত ক'রে বললো—

—ভাল আছো বিভুদা?

—এ্যাঁ! বিভুর মুখ থেকে বাণী নির্গত হলো।

—বলছি যে—ভাল আছ? ঝক্‌ঝকে দাঁত কটি হঠাৎ ঝল্‌সে উঠলো বিকেলের আলোতে।

—হ্যাঁ, না—তা' হ্যাঁ ভাল।—বললো বিভু।

তারপর দিন।

তারও পর দিন······

দিন পনেরো······দিন কুড়ি······ত্ব'মাস।

বিভুর দোকান মাথায় উঠেছে। বাঁধা খরিদ্দার রেগে অন্য দোকানে চলে যাচ্ছে। কে কার কড়ি ধারে? গোপনে সুরধুনীকে সে দিয়েছে তিন ভরির একটা হার, আটগাছা ক'রে ষোল গাছা চুড়ী, পান্নার আংটি একটা, কাণের একজোড়া ভারী পাশা। সব নিয়ে গিয়ে সুরধুনী নিজের ট্রাংকে লুকিয়ে রেখেছে, কবে পরবে কে জানে!

বেগম গঞ্জের বারোয়ারী যাত্রা······

সবাই গেছে যাত্রা শুনতে, শাশুড়ীর সঙ্গে সুরধুনীও গেছে। "অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ" পালা।

গান জমে গেছে···

মানুষ শুব্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে শুনছে। অনেকক্ষণ থেকে সুরধুনী উস্‌খুস্‌ করছিল; এইবার সুযোগ পেয়ে বললো—মা, আমার শরীল্‌ট্যা খারাপ লাগ্‌ছে। বাড়ী চোল্‌য়্যা যাবো?

—একলা যাবা? পাম্‌ব্যা?

—হ্যাঁ।

—উঠ্যা একবার চোখ বুলিয়ে ছ্যাখোধিনি—মতিকে দেখতে পেছো কিনা?

সুরধুনী উঠে দাঁড়ায়, চারিদিক দেখে বলে—না না, দেখতে পেছিন্যা তো!

—তেবে যাও। লক্ কোর্য়্যা যেয়ো বেটা, হোক্?

বাজারটা পেরোতেই একটা বন্ধ দোকানের অন্ধকার বারান্দা থেকে নেমে এলো বিভু, তার তার হাতে একটা বড় সুটকেস্। ফিস্ফিস্ করে বললো

—দেরী হলো ক্যানে?

—বুঢ়ী যদি 'না' বল্তো—তেবে কী হতো? লহমু করা বের্হিয়ে যেতো হে লব-লটবর?

—সুট্কেশ্ লিব্য়্যাতো?

—লিবোনা ক্যানে?

—তাই বুল্ছি।

—আমার বড্ডাই গতিক্ খারাপ লাগ্ছে বিভুদা? কীজানি—কী হ'তে কী হ'য়ে যাবে? কাল বিহানে খবর শুনলে কি কেউ লক্ ক'রে থাকবে? না কী বুলছো?

—যা হবার তাতো হয়্যাই গিয়্যাছে। 'বাড়ীর মধ্যে দেরী করিস্ন্যা কিন্তু।

—না হে না।

কোলকাতায় এসেছে ওরা মাস ছয়েক। শোভাবাজারের একতলার দু'খানি ঘর নিয়ে ওদের সংসার। একখানি শোবার, অপরটি দোকান।

দোকান ছোট হ'লেও বিভু আশে পাশের দোকান থেকে অর্ডার পত্র পায়। সূক্ষ্ম কাজকর্ম্মের খ্যাতি ইতিমধ্যে উত্তর কলিকাতায় বহু গহনা-বিলাসী সরু মোটা গৃহিণী শুনেছেন। অনেকেই স্বামী-পুত্র এবং চাকর মারফৎ সরাসরি কাজ পাঠাচ্ছেন বিভুকে। বিশেষ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গীয় ধনী গৃহিণীরা নিজেরাই আসেন ডিজাইন্ বোঝাতে···

ফলে, অর্থাভাব নেই বিভুর। তারা স্বামীস্ত্রী (তাই বলতে হবে, কেননা মহানগরের পরিবেশে তারা স্বামীস্ত্রী) বেশ সুখে আছে, আনন্দে আছে। সারাটা দিন বিভু কাজ করে দোকানে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সুরধুনী এসে বসে বিভুর পাশে। মন দিয়ে লক্ষ্য করে গহনার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। একদিন বিভু ঠাট্টা ক'রে তাকে বললো—

—কী ছাখো বোস্য়্যা ? চূড়ীর ছিল্য়্যা তুল্তে পার্‌ব্যা ?

—ক্যানো পারবো না ? (সুরধুনী সভ্য হচ্ছে। মেয়েদের গ্রহণ শক্তি অসাধারণ, তাই, না ?)

—কই, করো খিনি ?

হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বিভুর কাছে বসলো সুরধুনী, তারপর কুশলী হাতে সে যখন চূড়ীর ছিলে কাট্‌তে আরম্ভ করলো—তখন বিভুর পক্ষে হাঁ করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর রইলোনা। সে প্রবল বলে সুরধুনীকে জড়িয়ে ধরলো শুধু।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সব ক'দিন সুরধুনী দোকানে এসে বস্‌তে পারেনা ; কেননা সে সময় বাড়ীর অন্যান্য তলার মেয়েরা, এবং পাড়ার পাঁচ সাতটি মেয়ে এসে জড়ো হতো। গান গল্প চলতো, তাসও চলতো, কোন কোন দিন ক্যারম, লুডো, মায় গোলকধাম অবধি চলতো। বিকেলের ছায়া নেমে এলে সকলকে নিজের হাতে চা তৈরী ক'রে খাইয়ে

তবে বিদায় দিত। সুরধুনীর মিষ্টি ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ। একদিন যে এসেছে, সে আর একদিন আসবার সময় পাড়ার আর দুটি নতুন মেয়েকে ডেকে আনে। এই সব সভায় কথা হতো নিম্নলিখিত প্রকার—

—কী যে হবে মাসী! সোনার দর যে রকম চড়ে গিয়েছে—কী যে আছে কপালে। পাকা সোনার কাজ যতই ভাল হোক, গিনি সোনার জোলুষের কাছে সে তো কিছুই নয় দিদি। না কী বলো? খাদ মিশিয়ে মিশিয়ে আজকাল একরকম হচ্ছে বটে, কিন্তু সে সব টিঁকবেনা। ...মা রে মা! একশো বারো টাকা ছ' আনা—সোনার দর! তবে হঁ্যা, তুমি যে চূড়ীর কথা বলছিলে দিদি, সে আমি আমি ওকে শুদিয়েছি —বোঞ্জএর উপরে ক'রে দেওয়া যায়।

দিবারাত্রি সোনার কথা, রূপোর কথা, পানের কথা, চূড়ীর কথা, গয়নার কথা—সুরধুনীর মুখে লেগেই আছে। আর সে ভুলেও হাতীর দাঁতের কথা বলেনা। এক মুহূর্ত্তের জন্যও না। যেন হাতীর দাঁত বলে কোন বস্তুর নামই সে শোনেনি কখনো। পাড়ার আশেপাশের বাড়ীতে মেয়েরা গান শেখে। সুরধুনীর কাছে যারা আসে, তাদের মধ্যে অনেকেই গান জানে। একদিন রাত্রে বিভুকে বললো সে—

—পয়সা কড়িতো পেছো মন্দ নয়। আমার একটা গানের মাষ্টার ঠিক ক'রে দাও না।

—ক্যানে? (বিভু কোলকাতার ভাষায় অত মন দেয়নি)

—ক্যানো আবার? গান শিখবো!

—তুমি গান গাহিব্যা নাকি?

—হঁ্যা।

—মাষ্টার আমি কতি পাবো?

—আচ্ছা তাহ'লে আমি শুধাব অমিতাকে।

তাই হ'ল। অমিতার গানের মাষ্টার কমল কুমার সুরধুনীকে গান শেখাতে সুরু করলো। কমল কুমার ভাল গাইয়ে। সহরে তার বহু ছাত্র ছাত্রী আছে। সে সব ছাত্রীদের রূপও আছে, রঙও আছে। কাজেই ছাত্রীদের সৌন্দর্য্য নিয়ে নিতান্ত বেকুব মাষ্টার না হ'লে মাথা ঘামায়না। কিন্তু কমল কুমার কী দেখলো সুরধুনীর মধ্যে—কে জানে, সে একঘণ্টার জায়গায় দুঘণ্টা, তিনঘণ্টা করে গান শেখাতে লাগলো।

প্রতিভাময়ী সুরধুনী। যখন সে গান গাইতো, মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকতো কমল কুমার। মুখতো নয়, যেন পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি। গায়ের রঙটা তার কোলকাতার জলে শ্যামাভ হ'য়েছে। দূর থেকেই তার গাত্র-চর্ম্মের কমনীয়তা অনুভব করা যায়। টানা টানা দুটি চোখ, টিকোলো নাক, পাতলা দু'খানি ঠোঁট, সর্ব্বোপরি তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কী যে ছিল সে দৃষ্টির মধ্যে—অজগরের দৃষ্টি-মুগ্ধ হরিণের মতো কমল কুমার ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। সর্ব্ব অঙ্গের মধ্যে সুরধুনীর যে জিনিষটি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্য। নিটোল, অটুট নিভাঁজ স্বাস্থ্য। তার যৌবন এই স্বাস্থ্যের হাত ধরে সমস্ত শরীরে যেন দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে। এই স্বাস্থ্য যেন সংবাদ ব'য়ে আনে হাওয়া লাগা পল্লীগ্রামের ধান ভরা মাঠের, নিবিড় অরণ্যের, মুক্তনীল আকাশের। সুরধুনীর দিকে চেয়ে থাকলে কমল কুমার অনুভব করতো যেন এই ইঁট কাঠ-ইলেকট্রিকের যাদুপুরী কোলকাতার বাইরে মুক্ত পৃথিবী তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। মনে হতো এই নারীকে সঙ্গিনী ক'রে বাধাহীন বন্ধহীন ঘাটে মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো যায়। সজ্‌নে শাক আর ভাত খেয়ে সাঁওতালদের জীবন যেমন স্বচ্ছন্দ, সানন্দ,—তেমনি জীবন বরণ করা

যায়। কী হবে এই সহর আর সভ্যতার ধার করা আড়ষ্ট আদব কায়দা দিয়ে?

অল্প দিনেই, অর্থাৎ বছর খানেকের মধ্যেই সুরধুনী গান বাজনায় বিশেষ দক্ষ হ'য়ে উঠলো। চার পাঁচটি রাগ রাগিনী শাখা প্রশাখা সমেত এমন ভাল ভাবে সে গাইতে সুরু করলো যে—কমল তাকে নিয়ে দু'একটা সভা সমিতিতেও যেতে আরম্ভ করলো। এমনও হ'য়েছে যে বালীগঞ্জে গান বাজনা সেরে তাদের বাড়ী ফিরতে রাত্রি একটা বেজে গেছে। বিভু দোকান বন্ধ ক'রে ঢাকা দেওয়া খাবারটা খেয়ে নিয়ে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। সুরধুনী যে উত্তরোত্তর এত নাম করছে --এতে বিভুও খুশী!

—সেদিন—

বালিগঞ্জে জলসা সেরে ওরা যখন গাড়ীতে উঠলো, তখন রাত্রি ১টা বেজে গেছে। গাড়ীর মধ্যে বসে আছে দুজনে। ক্লান্ত কমলের মাথাটা সুরধুনীর কাঁধে। অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হ'য়েছে তাকে। নির্জ্জন পথ দিয়ে গাড়ী ছুটেছে,—মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে তারা। এখানে ওখানে জ্বলেছে নিওন-সাইন, দুটো একটা পেট্রোল ষ্টেশনে অলোর লেখা জ্বলছে···দুটি একটি পুলিশ; একটি দুটি মাতাল···খাঁ খাঁ করছে পথ।···

—মাথাটা টিপে দেবো একটু?

—না। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো কমল। তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। সুরধুনীর দেহের উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে তার রক্তের উত্তাপে। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকার পর কমল কুমার যেন মনস্থির করলো। উঠে সরে বসে বললো—সুরো!

—কী ?

—তুমি আমি একটা নতুন বাঁধনে পড়েছি। আমার অনেক আশা-তোমাকে আমি আরও শেখাবো, অনেক শেখাবো। দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে গিয়ে তোমার গলায় পরিয়ে আনবো জয়ের মালা ?

সুরধুনী চুপ ক'রে বসে রইল। কারণ কথাতো শেষ হয়নি কমল কুমারের। শেষ না হ'লে কী জবাব দেবে সুরধূনী ? গান শেখার মত্ততায় নিজের মনের দিকে তাকায়নি অনেক দিন সে। আজ এই নির্জ্জন পথে ধাবমান মোটর গাড়ীতে কমল কুমারের পাশে বসে—নিজের ভিতরের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠলো। এ কে বসে আছে তার বুকের রত্ন সিংহাসনে—রাজার মুকুট পরে ? কোথায় মতি ? বিভু কোথায় ? কোথায় সোনা-রূপা-তামা-পেতলের ঝক্‌মকানি··· ।

—আপনার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। চুপি চুপি বললো সুরধুনী।

এই ঘটনার পরের তিন বছরের খবরে কোন বৈচিত্র্য নেই। সুরুতে সেই দুটি সুটকেশ, সেই রাত্রের অন্ধকারে ষ্টেশনে এসে দু'খানি টিকিট···দুরু দুরু বুকে নূতনের হাতে চোখ বুঁজে আত্ম সমর্পণ···

কমলকুমার বোকামী করেনি। তাই সে বাংলা দেশের আওতা থেকে বেরিয়ে একেবারে চলে এসেছে নয়া দিল্লী। স্বাধীন ভারতের গরবিনী অধিকারিণী। প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাঁদের আবিষ্কার করতে সঙ্গীতপ্রিয় জনতার একটু অসুবিধা হ'য়েছিল। তারপরই সুরু হ'ল ট্যুশানি। তদারক এবং তদ্বির ক'রে কমলকুমার অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করলো, সরকারের আধা সহযোগিতায় এবং সাহায্যে। সুরধুনীর নতুন নাম কলাবতী। কমলকুমার স্কুল নিয়ে মেতে আছে,

কলাবতী করে ট্যুশানি। তার ছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে একটিও নেই, সবই প্রায় স্বাধীন ভারতের আমীর ওমরাহ মন্ত্রীমণ্ডলী এবং এম-পি দুহিতা।

আজকের কলাবতী কিন্তু আমাদের গিরীশ মিস্ত্রীর কন্যা সুরধুনী নয়। এ কলাবতী,—তন্বী, শ্যামা, শিখরীদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি। শিক্ষিতা এবং উচ্চ গুণ সম্পন্না। এর চলার ও বলার একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে—যেটা তার ছাত্রীরা নকল করতে ভালবাসে। এই কলাবতীর ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়, এর মুদ্রা-দোষের কথা গর্ব্বের সঙ্গে ক্লাবে ক্লাবে অলোচনা হয়।

সেদিন কলাবতী এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিল—

—সঙ্গীত আমাদের জীবনের হৃদ্‌পিণ্ড। হৃদ্‌পিণ্ড যেমন জীবনীশক্তির আধার,—সঙ্গীতও তেমনি জাতির সভ্যতার ও আত্মশক্তির আধার। যে কোন গান,—তা'সে গান যো গান, যেমন গান, যার গানই হোক্—সুরে, লয়ে গাইতে পারলে তার একটা অর্থ হয়। তান-বাট-ঠাট-বিস্তারের মারপ্যাচ্ নিয়ে মাথা ঘামিয়োনা তোমরা। প্রত্যেকটি সুরের সত্যকার রূপ নিয়ে ধ্যান করবে; তারপর তার রূপ দেবার চেষ্টা করবে। জনতাকে খুশী ক'রে প্রাইজ নেবার প্রতিযোগিতায় মেতোনা, নিজেকে খুসী করবার সাধনায় ডুবে যাও।··· এই অবধি বলে একটু থেমে, আবার বললো—শুধু গান বলেই কথা নয়, জীবনের যে কোন কাজ, যে কোন্ কর্ত্তব্য—যা ক'রে নিজের আত্মার তৃপ্তি হবে—তা' করতে দ্বিধা করবেনা। পাপ পুণ্যের বিচার করবে আঙুলে গোণা যায়—এমন কয়েকটি মানুষ, তার বাইরে আর কিছুই নেই।

জীবন হচ্ছে নদীর মতো। নব নব অভিজ্ঞতার বন্ধুর পথ বেয়ে সাফল্যের সমুদ্রে গিয়ে সে মেশে। সেই যাত্রা পথে যদি সমাজ আর সংস্কার নামে প্রকাণ্ড পাহাড়ও মাথা তুলে দাঁড়ায়—নদীর আন্তরিকতার কাছে সেও হার মানবে। কিন্তু কেন বললো কলাবতী ওই শেষের কথাগুলি? তবে কি তার মনেও পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতির চোরকাঁটা আজও বাজে? কী জানি! দুর্জ্ঞেয়া রহস্যময়ী, ভাগ্যের দুলালী কলাবতী,—প্রখ্যাত গায়ক কমলকুমার করের স্ত্রী সে, তার কথার রহস্য ভেদ করা—কি এতই সহজ?

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে—

নয়াদিল্লীর অভিজাত পল্লী। সামনে বাগান রেখে ছোট্ট একটু খানি ছবির মতো বাংলো। ঝক্‌মকে একখানি টু সীটার থেকে নামলো কলাবতী, তার পিছনে পিছনে একটি অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। তার ভঙ্গী দেখে মনে হয়—অবাঙালী। তারা এসে উঠলো ড্রয়িংরুমে। তাকে বসতে বলে কলাবতী ভিতরে গেল, এবং দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে যুবকটির সামনে বসে বললো—

—তোমার 'ভারশ' (ওয়ারশ?) যাত্রা স্থির?

—হ্যাঁ।

—আসছে জানুয়ারীতেই?

—হ্যাঁ। দোস্‌রা। হাসিমুখে এবং বিনীত ভঙ্গীতে বললো যুবক।

যুবকের নাম দীপম্‌ আয়ার। সবাই জানে ডি, আয়ার। ছেলেবেলা থেকে শান্তি-নিকেতনে শিক্ষা সমাপন ক'রে সে বিলেত গিয়ে আই-সি-এস হ'য়ে আসে। এখন দিল্লীর রাজনীতি তাকে দলে টেনেছে। তার কাকা একজন বিরাট মানুষ। সুদর্শন চেহারা এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে সে নয়াদিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যমণি। মাস ছয়েক আগে থেকে কী যে তার

হ'য়েছে, নিজের বন্ধু বান্ধবী এবং ক্লাব সে ছেড়ে দিয়েছে,—বিলিয়ার্ডে মন বসে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘণ্টা দশেক সে কলাবতীর সঙ্গেই থাকে। নিজে খুব ভাল বাংলা বলতে পারে—প্রায় মাতৃভাষার মতো,—এবং গানবাজনার দিকেও তার ঝোঁক খুব। সম্প্রতি মন খারাপের কারণ,—পোল্যাণ্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে সে নিযুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আগামী জানুয়ারীতে যেতে হবে,—তারই প্রস্তুতি চলছে ধীরে ধীরে।

বেয়ারা ট্রেতে ক'রে চা ও কিছু খাবার নিয়ে এল। আয়ার বললো—আমি কিছু খাবো না কলা।

প্লি-ই-জ! ওগুলোর দিকে চেয়ে দেখো—আমার হাতের তৈরী গোকুল পিঠে রয়েছে। ওই যে মুখ কালো ক'রে বসে আছে—ওদের একটিকে খাও!

দেখা গেল—আয়ার একটা একটা ক'রে গোটা পাঁচেক গোকুল পিঠে খেয়ে ফেললো। চা টা খেয়ে দুজনে গিয়ে বাগানে বসলো। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে শূন্য পথে। শান্ত স্তব্ধ সন্ধ্যা···

—তোমাকে হারিয়ে কয়েকটা দিন বেশ ফাঁকা ঠেকবে আয়ার। কলাবতী বললো আপন মনে।

ধীরে ধীরে কলাবতীর নরম দক্ষিণ করতল নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো আয়ার। তারপর বললো—

—ফাঁকা যাতে না লাগে, তাই করো না কলা!

—কী করবো বলো?

—বলবো?

—বলো! আয়ারের দিকে না চেয়ে শূন্যে চোখ রেখে বললো কলাবতী। যেন আসন্ন বক্তব্যের প্রতি তার আকর্ষণ কম।

—চলো আমর সঙ্গে ভারশ?

চুপচাপ। কোথায় যেন কার শিশু কাঁদছে···অবাধ্য-মানব-সন্তান।

—কী পরিচয় সেখানে আমার?

—কেন! মিসেস আয়ার!

একটুও চমকালোনা কলাবতী। বৃহত্তর পৃথিবীর হাতছানি। সভ্যতা আরাম-আনন্দ-যশ-অর্থ-আজ তার হাত ধরে সঙ্গ ভিক্ষা করছে। কী আশ্চর্য্য জীবন!

—মিঃ করের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি—একথা তুমিই আমায় বলেছ। তুমি পৃথিবীর প্রিয়া—তোমার ওপর কোন একজনের দাবী থাকা উচিত নয়।···আমার জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিওনা কলা। আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে নিয়ে। ভারত্ গিয়ে—দুজনে মিলে আমরা ঘুরবো পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। যাব কন্টিনেণ্টের প্রত্যেকটি জায়গায়,—ইংল্যাণ্ডে, আয়ার্ল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, রাশিয়ায়। কয়েক বছর পরে যখন বাড়ী ফিরবো তখন জাপান, চীন, বার্ম্মা, অষ্ট্রেলিয়া হ'য়ে বাড়ী ফিরবো; হয়তো তখন আমাদের সঙ্গে ফিরবে—আমাদের একটি স্বাস্থ্যবান বাচ্চা।

অন্যমনস্ক ভাবে উঠে দাঁড়াল কলাবতী, সঙ্গে সঙ্গে আয়ারও।—নাইন্‌টি আজ নিয়ে যাও,—বাকী টেন্ পারসেণ্ট কথা কালকে সন্ধ্যায়, কেমন? আশা করি, এই সময়টুকুর মধ্যে তুমি মরে যাবেনা।

—না। বাঁচবো। যদি মরেও যাই, তবে তোমাকে পাবার জন্য আমি জন্ম জন্ম ঘুরে আসতে রাজী আছি কলাবতী।

—ক্ল্যা-টা-রা-র! কলার চোখে আগুন-রঙা কৌতুকের ঝিলিক··· আয়ার চলে গেল। বেয়ারাটা রাত্রের খাবারের জন্য মুরগী ছাড়াচ্ছে··· মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলেও···ধড়টা নড়ছে। নড়ুক।

ওটা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের জন্য, বাঁচার জন্য প্রয়োজন। এমন কত মুরগী যে তার যাত্রাপথে ছিন্ন বিছিন্ন হ'য়ে পড়ছে, পড়বে, তার কি কিছু ঠিক আছে ?

কোলকাতার শোভাবাজারের বিভু দোকান বন্ধ করলো। শরীর ভাল নেই। ভাল লাগেনা আর রাত অবধি ভাত-ভিক্ষের জন্য বসে বসে মেয়েদের গায়ের গয়না গড়াতে···

অন্ধকার পল্লীগ্রামে কেরোসিন বাতির সামনে খস্‌খস্‌ ক'রে যন্ত্র চালাচ্ছে মতি মিস্ত্রি। এইবার সে হাতীর দাঁতের তাজমহল গড়বেই গড়বে। কে যেন তাকে বলেছিল যে ওটা কোন্‌ রাজার বৌয়ের কবর। হ'তেই পারেনা। তাজমহল যার নাম,—তা কি কখনো কবর হ'তে পারে ? আর তাই যদি হয়, তবে—হাতীর দাঁতের কবরই গড়বে সে···। তারপর একটু তাড়ি খাবে আজ···

গিরীশ মিস্ত্রী মারা গেছে······

পৃথিবীটা কোন রকমে যদি আর কয়েকটা দিন সূর্য্যের চারপাশে ঘুরে আসতে পারে—তাহ'লেই দোসরা জানুয়ারী···

১০২৪
২৫.২.৮১